

চেতনা-র অন্বেষণে

ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ২০২২

স্বর্গের দাবি মিথ্যা, আকাশজুড়ে গ্রহ নক্ষত্র

হিজাব, একটি বিতর্ক এবং..

বিজ্ঞান কী?

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

সূচি-

যুক্তিবাদীরা গ্রুপের মাসিক পত্রিকা **'চেতনার অন্বেষণে'** ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ২০২২।

পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো আমাদের ওয়েবসাইটে।

সম্পাদকমন্ডলী- **যুক্তিবাদীরা।**

যোগাযোগ:
ই-মেইল - yuktibadira@gmail.com
টেলিগ্রাম- https://t.me/Yktibadira

মূল্য- ত্রিশ টাকা
ওয়েবসাইট-
https://rationalists.wixsite.com/chetona

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ:

কবিতা:

সম্পাদকীয়

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকাটি বরাবরই যারা লেখালেখি করেন না তাদের উৎসাহিত করে লেখার জন্য। আমরা চাই সমস্ত মুক্তচিন্তক কলম ধরুক। তাদের ভাবনা প্রকাশিত হোক ম্যাগাজিন, সোশ্যাল সাইটে। আপনারা যেমন পারবেন যতোটা পারবেন প্রতিমাসে লিখতে থাকুন এবং পাঠান yuktibadira@gmail.com এ। আনিস খানের হত্যার তীব্র নিন্দা জানাই। পাশাপাশি সামনেই ভাষা দিবস গেল, সবাইকে ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। বাংলায় নিজের মনের কথা আরও প্রকাশ করুন। ধন্যবাদ।

২৪-ফেব্রুয়ারি-২০২২

"ধর্মকে আসলে স্রেফ ভাইরাস হিসেবেই চিহ্নিত করা প্রয়োজন। ধর্মের সংক্রমণ, পুনরুৎপাদন এবং প্যারাসাইটিক বৈশিষ্ট্যগুলো কেবল ভাইরাসের মধ্যেই দেখা যায়। এমনকি ভাইরাসের চিকিৎসার ব্যাপারটিও ধর্মের সাথে অনেকটাই মেলে।

— অভিজিৎ রায়

চেতনা বিকাশের হাতিয়ার

- মহম্মদ মহসীন

একটা বেশ সাত্বিক সাত্বিক গন্ধ মাখা কথা আমাদের সমাজে বেশ চালু। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মেশাবেন না। ধর্ম থাকুক ধর্মের জায়গায় আর রাজনীতি থাক রাজনীতির জায়গায়।

আসলে আমরা ধর্মের ইতিহাস অনেকে জানি না, অনেকে আবার জেনেও অজানাদের মতই অসচেতন। মানব জীবনে রাজনীতি এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার সাথে ধর্মীয় কিছু আবেগ মিশিয়ে দিতে পারলেই স্বার্থ সিদ্ধ হয়, সংগঠিত করার কাজ সহজ হয়। এ কথা বোধহয় আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে ধর্মীয় স্বার্থ আর রাজনৈতিক স্বার্থের সার্থক ককটেল একটা বাজারে ছাড়তে পারলেই, জনগণের মনের তৃষ্ণা যেন আরও বাড়িয়ে দিয়ে সেই দলটির 'আমি তোমাদেরই লোক' ভাবটির যে ভাবে স্পষ্টকরণ সম্ভব; তা বোধহয় শত বক্তৃতা বা হাজার কাজের বাস্তবায়ণের মাধ্যমেও ফলপ্রসূ দেখি না।

মানুষ মূলগতভাবে প্রথমত একটি প্রাণী। সামাজিক প্রাণী। মানবেতর অন্যান্য প্রাণীর প্রায় খাড়া দ্বিপদ প্রাণী। তিনি মানুষ হয়ে উঠতে পারেন শুধুমাত্র তাঁর যুক্তিবাদী চেতনা গ'ড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে। এই চেতনা গ'ড়ে ওঠার পথে সহস্র প্রতিবন্ধকতা।

প্রথম থেকেই শিশুর শিখনকালে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কুশিক্ষা ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা জগৎ ব্যাপী বিস্তৃত। শিশুর মনে ভূত, প্রেত, ঈশ্বর বিশ্বাস প্রভৃতি অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার প্রবিষ্টকরণের কাজে অভিভাবক, প্রতিবেশী, শিক্ষক-শিক্ষালয় এক কথায় সমগ্র সমাজ যেমন উঠে পড়ে লাগে তাতে সেই শিশুটিকে কুসংস্কারাচ্ছান্ন করে গড়ে তোলার লব্ধ মিশন লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সামান্যতম সুযোগ থাকে না। এই চক্রব্যূহ ভেদ করেও যাঁরা কেন, কী, কোথায়, কবে, কীভাবে , প্রশ্ন করতে শেখেন, চিন্তা করেন, চিন্তা করার সাহস পান, তাঁদের বলা যায় যুক্তিবাদের পথের পথিক, অর্থাৎ যুক্তিবাদ সম্পন্ন প্রাণী -মনুষ্য। যুক্তিবাদ বিবর্জিত প্রাণী মনুষ্য পদবাচ্য হতে পারে কি?

অবশ্য আজ পর্যন্ত এমন কাউকে আমি দেখিনি, যিনি নিজেকে কুসংস্কারগ্রস্ত, নিজেকে অন্ধবিশ্বাসী মনে করেন। সকলেই নিজেকে যুক্তিবাদী মনে করেন। ধর্মের কুসংস্কার প্রচার করা যারা পেশা হিসাবে নিয়েছেন, তাদের নামের সামনে দেখি, যুক্তিবাদী বিশেষণ। হাসি পেলে হাসি চেপে চুপে থাকাই সেখানে বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ দশচক্রে পাথরকেও ভগবান বানানো হয়। হাসি চেপে রাখতেই হয় যখন কাঠের তৈরী ঠাকুরের হেলথ চেক আপ করেন এম বি বি এস, এম ডি ডাক্তারে, কাঠের বুকে সত্যিকারের স্টেথোস্কোপ ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে।

বন্ধু বলার কিছু নেই, এভাবেই কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে শিক্ষার বলি ঘটে প্রতি মুহূর্তে।

রাজনীতি ছাড়া তো সমাজ চলে না। ধর্মকেও এতটাই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিক জীবনশৈলীর প্রতিটি ক্ষেত্র জুড়ে আছে ধর্ম, কুসংস্কার। অন্ধবিশ্বাস। যুক্তিবাদীদের নিয়েও মানসিক প্রমোদ লাভের মেনু উপভোগ করতে পারেন কবজি ডুবিয়ে কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের খাদ্য ভক্ষণ থেকে পানীয় পান করে ঢেঁকুর তোলা পর্যন্ত। তারপর কুশিক্ষার পান চিবানোর পর্ব সম্পূর্ণও বাদ যাবে না।

ভূতে বিশ্বাসকে অনেকেই যুক্তিবাদের বিপরীত গোষ্ঠীভুক্ত করেন। খ্যাতনামা এক সাহিত্যিক, যিনি নিজেকে যুক্তিবাদ বিবর্জিত প্রাণী বলে আদৌ মনে করেন না বলেই জানি, তিনিও অকপটে বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন ভূত আছে, চতুর্দশীতে তেঁনাঁরাঁ এসেও থাকেন।

ভূতে অবিশ্বাসী যুক্তিবাদীরা আবার ভগবানে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন।
আরও দেখবেন, ভগবানে অবিশ্বাসীরা আবার জ্যোতিষকে বিজ্ঞান বলে চেঁচিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। বিজ্ঞান ক্লাবের কর্তাব্যক্তিদের হাতেও দশ আঙুলে দশাধিক স্টোন সমন্বিত আংটির শোভা দেখে মূর্ছা-ভাব কারুর অভিজ্ঞতায় থাকাটা স্বাভাবিকের থেকেও বাস্তব।

আবার জ্যোতিষকে অবিজ্ঞান অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার বলে বুঝেছেন, তাঁদের মাঝেও অনেকের কাছে হোমিওপ্যাথি নিয়ে বলুন, সেই জ্যোতিষ বিরোধী যুক্তিবাদীমন্য লোকেও রে রে করে উঠবে।

এ হ'ল যুক্তিবাদীদের এক ঝলকের পরিচয়।
খুব আশ্চর্যের ব্যাপার যখন যুক্তিবাদীরা তাদের একজন গুরুকে খাড়া করে দেন। আবার সেই গুরুর দলে কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পর যখন কলিকালাভ না হওয়াতে গুরুবিরোধিতার শক্তি অর্জন করতে ভূতান্বেষী বিজ্ঞানীদের ধরে ঝুলে পড়েন।

এরা নিজেদের মধ্যে নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে এমনভাবে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করেন যে এ নিয়ে অলিম্পিকে ইভেন্ট থাকলে নির্দ্বিধায় সর্ব জাজের সম্মতিক্রমে উভয়পক্ষকেই প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করা যেতে পারতো।
যুক্তিবাদী আন্দোলনের কত বড় ক্ষতি এঁরা করে চলেছেন, তার তল পাওয়া দুস্কর।
তাহলে উপায়? সব ছেড়েছুড়ে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকবো?

না হাজার পথ খোলা। পথই পথ দেখাবে।
পেশী শক্তির বিকল্প মসি শক্তি।

কলম ধরতে হবে। ওটাই যুক্তিবাদী চেতনা বিকাশের হাতিয়ার।

আদম চরিত

- মুখফোড়

পোষাক নিয়ে আলোচনায় এই লেখাটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। লেখক কে জানি না, কেউ জানলে বলবেন -

ঈশ্বর গলা খাঁকরাইয়া কহিলেন, "ব্যাপার কী আদম, এই প্রাতঃকালে তোমার এইরূপ উত্থিত দশা কেন? চুরি করিয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ কর নাই তো?"
আদম গোঁ গোঁ করিয়া কহিল, "ঈভের জামাকাপড় ঠিক নাই।"
ঈশ্বর কহিলেন, "তাই বলিয়া তুমি এইরূপে তোমার শ্রীলঙ্কাটিকে বাগাইয়া চলাফিরা করিবে?"
আদম কহিল, "কী করিব? ঈভ তাহার নিকটে ঘেঁষিতে দেয় না। তাহার সহিত কোনক্রমেই কোন কিছু ঘটিবার নহে। তাহাকে যতই তেলআবিব দেই না কেন, সে একটি জেরুজালেম!"
ঈশ্বর কহিলেন, "তোমাকে দুই দুইটি হস্ত নির্মাণ করিয়া দিলাম আদম, বিপদে আপদে কার্যে প্রয়োগ করিতে।"
আদম কহিল, "হস্ত পদ সকলই প্রয়োগ করিয়াছি প্রভু। উহাদিগের দিন শ্যাষ।"
ঈশ্বর কহিলেন, "এখন আমার দরবারে আসিয়াছ কী আবদার লইয়া?"
আদম কহিল, "আপনি ঈভকে পর্দা করিতে বলুন।"
ঈশ্বর কহিলেন, "ঈভ তো বস্ত্র আচ্ছাদন সকলই প্রয়োজনীয় পরিমাণে করে বলিয়া জানি।"
আদম কহিল, "উঁহু, তাহার বস্ত্র যথোচিত পরিমাণে নাই। খাটো কাঁচুলি পরিধান করিয়া সে তাহার তামিলনাড়ু দুটি ইচ্ছা করিয়াই প্রদর্শন করিয়া বেড়ায়। তাহার ঘাগড়াটিও তাহার বুন্দেলখণ্ডকে ঠিকমত আবৃত করে না।"
ঈশ্বর কাশিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ঠিকাছে। আমি ফরমান পাঠাইতেছি। ঈভ এক্ষণ হইতে তামিলনাড়ু ও বুন্দেলখণ্ড আবৃত করিয়া চলাফেরা করিবে।"

দুইদিন পর আদম পুনরায় ঈশ্বরের দরবারে হানা দিল।
ঈশ্বর আরশে বসিয়া অস্বস্তিভরে নড়িয়া চড়িয়া কহিলেন, "ব্যাপার কী আদম? তুমি তোমার এডিনবড়াটি পুনরায় এইরূপ বাগাইয়া আমার দরবারে আসিলে যে?"
আদম গোঁ গোঁ করিয়া কহিল, "ঈভের জামাকাপড় ঠিক নাই প্রভু।"
ঈশ্বর চক্ষু মুদিয়া কহিলেন, "আমি ঈভকে ফরমান পাঠাইয়া হুকুম দিয়াছি সে যেন তাহার তামিলনাড়ু ও বুন্দেলখন্ড ঢাকিয়া ঢুকিয়া চলাফেরা করে। গবাক্ষে উঁকি দিয়া আমি দেখিয়াছি, ঈভ আমার কথা মান্য করিতেছে। তাহার তামিলনাড়ু ও বুন্দেলখন্ড যথোচিত পরিমাণে আবৃত।"
আদম কহিল, "ঈভের নতুন বস্ত্রটি অত্যন্ত টাইট, জাঁহাপন! তাহার বস্ত্র তাহার তামিলনাড়ু ও বুন্দেলখণ্ডের উপর এমনরূপে আঁটিয়া থাকে যে আমি আমার নাগাসাকি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেছি না, সে শুধু ফুকুশিমা হইবার উপক্রম করিতেছে।"
ঈশ্বর গলা খাঁকরাইয়া কহিলেন, "হস্ত পদের প্রয়োগে সুফল ঘটিতেছে না?"
আদম গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "না!"
ঈশ্বর কহিলেন, "এখন কী করিব? আবদারখানা কী তোমার?"
আদম কহিল, "ঈভ যেন এখন শিথিল ঢিলাঢালা বস্ত্রাদি পরিধান করে খোদাবন্দ!"
ঈশ্বর কহিলেন, "ঠিকাছে। আমি ফরমান পাঠাইতেছি। ঈভ এক্ষণ হইতে ঢোলা আলখাল্লা পরিয়া চলাফেরা করিবে।"

দুইদিন পর আদম আবার ঈশ্বরের দরবারের দ্বারে ঘা মারিল। তবে হস্ত বা পদ দিয়া নহে।

ঈশ্বর দরজা খুলিয়া আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "ছি ছি আদম, তুমি তোমার হণ্ডুরাসটি এইরূপে বাগাইয়া পুনর্বার আমার পবিত্র দরবারে আসিলে যে? দশজন দেখিলে কহিবে কী?"
আদম গোঁ গোঁ করিয়া কহিল, "ঈভের জামাকাপড় ঠিক নাই মহাত্মন!"
ঈশ্বর চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ঠিক নাই মানে কী? আমি তো অলিন্দ হইতে দেখিলাম, ফরমান পাইবা মাত্র সে একটি ঢোলা আলখাল্লা পরিয়া বাজারে বরবটি দরদাম করিতেছে!"
আদম কহিল, "উহার মুখ দেখা যায় জাঁহাপন।"
ঈশ্বর কহিলেন, "মুখ তো দেখা যাইবেই। মুখ দেখা না গেলে বুঝিবে কীরূপে যে এটি ঈভ?"
আদম কহিল, "জাঁহাপন, আপনি কি মনিকালিউয়িনস্কিলের ঘটনা সম্পর্কে অবগত?"
ঈশ্বর মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, "উমমম, আচ্ছা, বটে?"
আদম কহিল, "হাঁ। কখনও কখনও মুখদর্শন করিলেও মোগাদিশু নিয়ন্ত্রণ কঠিন হইয়া পড়ে।"
ঈশ্বর কহিলেন, "আচ্ছা আমি ঈভকে ফরমান পাঠাইতেছি, সে মুখ ঢাকিয়া চলাফেরা করিবে।"

দুইদিন পর আদম ঈশ্বরের দরবারে পুনরায় হানা দিল।
ঈশ্বর ক্ষিপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আদম, তোমার সমস্যা কী? তুমি আবার তোমার হাম্বানটোটা বাগাইয়া আমার দরবারে আসিলে যে?"
আদম গোঁ গোঁ করিয়া কহিল, "ঈভের জামাকাপড় ঠিক নাই প্রভু!"
ঈশ্বর হুঙ্কার দিয়া কহিলেন, "আবার কী সমস্যা তাহার জামাকাপড়ে? আমি তো দেখিলাম সে একটি বস্তায় ঢুকিয়া বুটের ডাল কিনিতে বাজারে আসিয়াছে!"
আদম কহিল, "নন্দন কানন বড় বাত্যাপ্রবাহময় অঞ্চল প্রভু। বাতাসে ঈভের বস্তাটি তাহার অঙ্গে এইরূপে মাখিয়া যায় যে তাহার মেদিনীপুর ও রাওলপিণ্ডি দুটি পরিষ্কার ঠাহর করা যায়।"
ঈশ্বর দন্ত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন, "এখন কি নন্দন কাননে বাত্যাপ্রবাহ বন্ধ করিয়া দিবার আবদার লইয়া আসিয়াছ মর্কট?"
আদম গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "না। আপনি ঈভকে একটি ইস্পাতের সিন্দুকে ঢুকিয়া চলাফিরা করিতে আদেশ দিন।"
ঈশ্বর আরশের হেণ্ডুলে কীল মারিয়া কহিলেন, "ঠিকাছে! বলিতেছি! এইবার তোমার হনুলুলু নামাইয়া দূর হও!"

দুইদিন পর আদম পুনরায় ঈশ্বরের দরবারে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। উভয়ার্থেই।
ঈশ্বরের চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে আদমের পানে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি কী ভক্ষণ কর বল দেখি? আবার তুমি তোমার লিভারপুল বাগাইয়া আমার দরবারে হাজির হইয়াছ?"
আদম বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "ঈভের জামাকাপড় ... !"
ঈশ্বর হুহুঙ্কারে কহিলেন, "ঠিক নাই? ইস্পাতের নিরেট সিন্দুকে তাহাকে ঢুকাইয়াছি, দুইটি স্বর্গদূত ঠ্যালাগাড়িতে করিয়া সেই সিন্দুক লইয়া বাহির হয়, তারপরও ঠিক নাই?"
আদম গোঁ গোঁ করিয়া কহিল, "ইস্পাতের সিন্দুকটি বড় মনোহর!"

.

হোমিওপ্যাথি - এক অপবিজ্ঞানের চর্চা

-পরীক্ষিৎ চক্রবর্তী (আজিজুল শাহজি)

আমরা মানে এই ভারত বাংলাদেশের (পাকিস্তানের বিষয়টা ঠিক জানি না তবে ওটা ঐদিকে ও থাকবে আশা করি) এমন কোনও নাগরিক বোধহয় নেই যে এই হোমিওপ্যাথির স্বাদ পাননি। ছোটবেলায় বাবার হোমিওপ্যাথির বাক্স থেকে আর্নিকা বা নাক্স অথবা অন্য ওষুধ প্রচুর খেয়েছি। তাপ-উত্তাপ কিছুই ছিল না কারণ ওটা আমাদের শৈশবের কোনও মাথা ব্যাথার বিষয় ছিল না। পরবর্তীতে মাথায় পোকা ঢোকায় এক প্রাতঃস্মরণীয় লেখক রাজশেখর বসু (পরশুরাম)। ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই কৈশোর থেকে যৌবন এবং সবচেয়ে বড় ধাক্কা এলো যখন আমার মা এর ক্যান্সার ধরা পড়লো। প্রথাগত চিকিৎসা করাতে দৌড়েছিলাম বোম্বে (বর্তমান মুম্বাই) তে টাটা মেমোরিয়ালে। ডাক্তারবাবু রায় দিয়েছিলেন সার্জারি এবং কেমো। না, প্রথাগত চিকিৎসার বদলে তার চিকিৎসা করেন বেশ খ্যাতিমান এক হোমিও চিকিৎসক যিনি আমার মাকে অনেক বছর বাঁচিয়ে রাখার আশ্বাস দেন। না, মা বাঁচেননি, বুঝিনি বাঁচার কথা ও ছিল না। যাই হোক, এই ব্যক্তিগত অবান্তর কথার থেকে আবার লাইনে আসি।

হোমিওপ্যাথির ইতিহাস :

স্যামুয়েল হ্যানিম্যান বলে এক জার্মান ডাক্তার ১৭০০ সালের শেষের দিকে হোমিওপ্যাথির উপর কাজ শুরু করেন। সে সময়কার প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিকে হিউমারিজম বলা হয়। হিউমারিজম "দাবি" করে যে শরীরের সমস্ত রোগ শরীরের চার প্রকার তরল: কালো, হলুদ, রক্ত এবং কফ -এর তারতম্যের কারনে ঘটে। বলাবাহুল্য, এই নীতিটির কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এবং বর্জনীয়। মজার কথা হল এর বিরোধী ছিলেন হ্যানিম্যান। যে পদার্থের জন্য কোনও রোগের সূত্রপাত হয়েছে, সেই পদার্থের খুব অল্প পরিমান সেই রোগটিকে সারিয়ে তুলবে। অর্থাৎ হিউমারিজম যদি আপনার সর্দি কাশি লাগলে ওটা কমানোর কথা বলে, হানেম্যান তার উল্টো বলেন, আরও সোজা কথায় যা খেয়ে ওটা হয়েছে ওটার কম পরিমানে খেতে বলে। এই চিকিৎসাকে নাম দিলেন হোমিওপ্যাথি। এসেছে গ্রিক শব্দ হোমিওস (একই রকম) আর প্যাথোস (ব্যাধি) এই দুটোর সংমিশ্রণে।

হ্যানম্যান এবং তার সহযোগীরা এই পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর বিবরণ তৈরী করেন। নানান খনিজ আর লতা পাতা ইত্যাদির নানান প্রয়োগ করেন সুস্থ এবং অসুস্থ মানুষের উপর এমনকি নিজেদের উপর আর তার উপর একটি বই প্রকাশ করেন মেটেরিয়া মেডিকা। প্রথম দিকে তার এই ওষুধ /টোটকা কম পরিমানে ব্যবহার আর পরে একটা থিওরি খাড়া করেন, ঔষধের মাত্রা যত কম হবে তার প্রভাব তত বেশী হবে। এই নিয়মটিকে আমরা ডাইলুটিং বা লঘু করার একটি পদক্ষেপ বলতে পারি। হাস্যকর হল বর্তমান বিজ্ঞান বিশেষতঃ মূল ধারার স্বীকৃত চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে প্রকৃতপক্ষে ঠিক এর উল্টোটা ঘটে। যেমন, আপনার নির্দিষ্ট মাত্রার ক্রোসিন /প্যারাসিটামল এ জ্বর না কমলে মাত্রা বাড়াতে হয়।

মেটেরিয়া মেডিকার সর্বশেষ সংস্করণে প্রায় হাজারখানেক পদার্থকে হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহারের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ কোন রোগ বা কোন অসুখের জন্য কোন পদার্থ ব্যবহার করতে হবে বইটিতে সে ব্যাপারে কোনও নির্দেশনা নেই। এক্ষেত্রে প্রস্তুতকারক বা তথাকথিত হোমিও চিকিৎসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ১৮ শতকে এটা কম রিস্কি হওয়ায় আর সহজ হওয়ায় অনেকেই এর প্র্যাকটিস শুরু করেন। ১৯ শতকে এই প্র্যাকটিশিয়ান ছিলেন প্রায় ১৪ হাজার আর ২২ টি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষার কেন্দ্র। মেডিক্যাল সাইন্স এর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এর অতি দ্রুত পতন হয়। আজ ঐগুলো হয় বন্ধ অথবা আধুনিক মূল ধারার চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত হয়েছে। শেষ প্রতিষ্ঠানটি ১৯২০ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

আসুন এই পদ্ধতি কী ভাবে ওষুধ তৈরী করে ওটা এবার দেখি :

আমরা আগেই দেখেছি খনিজ, ভেষজ ইত্যাদির থেকে এই ওষুধের মূল পদার্থ নেওয়া হয়। এখন এই পদার্থকে এক ভাগের সাথে ৯৯ ভাগ অ্যালকোহল বা জলের সাথে মিশ্রিত করা হয়। দ্রবীভূত না হলে মিহি করে গুঁড়ো করে গুঁড়ো দুধ বা মিল্ক সুগারের সাথে মেশানো হয়। এই পদ্ধতির একটা ছবিও দেওয়া হল।

এইবার আসল খেলা, কেন এই চিকিৎসা নিছক একটি অবৈজ্ঞানিক!
এই ডাইলুশন এর একটা কাটাছেঁড়া করি। এক ভাগ জল/পানির এই ডাইলুশন রোমান X এ প্রকাশ করার রীতি। এখন ১X হল ১/১০ ঘনত্ব। ৩X হল ১/১০^৩ মানে ১/১০০০ ঘনত্ব। আর ১০০ ভাগ ডাইলুশন প্রকাশ করার রীতি হলো C। তাহলে ১C হচ্ছে ১/১০০ ঘনত্ব, ৩C হচ্ছে ১/১০০^৩ বা ১/১০০০,০০০ ঘনত্ব ইত্যাদি। বর্তমানে বাজারে পাওয়া হোমিও-টোটকাগুলো ৬X থেকে ৩০X মাত্রায় পাওয়া যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৩০C মাত্রার হোমিও-টোটকাও বাজারে বিক্রী হয়।

৩০X লঘুকরণের মানে হচ্ছে একভাগ মূল পদার্থকে ১০^৩০ অর্থাৎ ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ভাগ লঘুকরণ করা হয়েছে। এক কিউবিক সেন্টিমিটার, বা একটি ছক্কার কাছাকাছি আকারের মধ্যে ১৫ ফোঁটা জল/ পানি ধরে এই হিসেবে এক ড্রপ হোমিওপ্যাথিক পদার্থকে মেশাতে পৃথিবীর ৫০ গুণ আকারের জল/পানিতে সেটাকে মেশাতে হবে। পৃথিবীর পঞ্চাশগুণ আকারের একটি জল/পানিভরা পাত্র কল্পনা করুন। তারপর তাতে একফোঁটা লাল রং ছেড়ে এমনভাবে গোলান যাতে সেটা জল/ পানিতে সমভাবে মিশে যায়। হোমিওপ্যাথির "লঘুকরণের সুত্র" অনুযায়ী এরকম একটি বিশাল পাত্র থেকে এক ফোঁটা রং মিশ্রনের পর যদি একফোঁটা জল/ পানি নেওয়া হয় তাহলে তাতে লাল রংটির "নির্যাস" পাওয়া যাবে। অথচ ব্যাপারটি অসম্ভব।

রবার্ট এল. পার্ক, পিএইচডি একজন গুরুত্বপূর্ণ পদার্থবিদ এবং আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞান সোসাইটির নিবার্হী পরিচালক। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, একটি দ্রবণে দ্রাব্য পদার্থের ন্যুনতম একটি অনু বিদ্যমান থাকলেই কেবল পদার্থটি সেই দ্রবণে উপস্থিত সে দাবী করা যায়। এক অনু পদার্থ থাকতে তাই দরকার ১০^১৯ অনু জল/ পানির। হিসেব করে দেখা গেছে যে, মূল পদার্থের এক অনু পেতে চাইলে ৩০X মাত্রার হোমিও টোটকার দুই বিলিয়ন ল্যাকটোজ সুগারের দানা খেতে হবে। এই এক অনু মূল পদার্থের সাথে আপনার শরীরে যাচ্ছে প্রায় এক হাজার টন ল্যাকটোজ এবং তার মধ্যে থাকা ভেজাল ময়লাগুলো।
তাহলে ধরুন ৩০X ডাইলুশন হল মূল বস্তুর ১০^৩০ মানে ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ভাগ ডাইলুশন। সহজ হিসাবে এই পদ্ধতিতে ওই মিশ্রনে আপনি কোনও মূল ওষুধের কিছুই পাবেন না।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে হোমিওপ্যাথির উপকারিতা নিয়ে আগে বা এখনও আমরা লেখা পড়ি। রিডার্স ডাইজেস্ট একবার লিখলো পশুদের উপর হোমিওপ্যাথির ফলাফল পাওয়া যায়। না, একদম ভুল তা প্রমাণিত হয়েছে ২০০5 সালে। এখন আমরা কেন এই নিয়ে সরব হই না? নিজেরাও তো দেখেছি মা, বাবাকে, দিদিমা-ঠাকুরমাকে, ছোট্ট ছোট্ট গুলি বা পুরিয়া খেয়ে দিব্যি সেরে উঠতে। কারুর জ্বর, সর্দি ভালো হয়েছে তো কারুর বাচ্চার তোতলামি সেরেছে। আঁচিলের মতো গুটি একেবারে মিলিয়ে গেছে। আমরা জানি না, ওষুধ না খেলে ওগুলো নিজে নিজে সারত কিনা। বা কেউ মিষ্টি গুলি ছাড়াও বাচ্চাকে কাশির সিরাপ, জ্বরের ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন কিনা। কিন্তু মজা হলো, প্রচন্ড জ্বরে, অ্যাকসিডেন্ট এ অথবা অন্য কোনওভাবে হাড় ভেঙে গেলে বা অন্য কোনও ইমার্জেন্সিতে কেউ হোমিওপ্যাথি করার কথা মুখেও আনেন না।

রবার্ট এল. পিএইচডি একজন গুরুত্বপূর্ণ পদার্থবিদ লক্ষ্য করেন যে একটি মিশ্রণে কোনও একটি পদার্থের নূন্যতম একটি অনু থাকলেই কেবল পদার্থটি সেই দ্রবণে উপস্থিত সে দাবী করা যায়। এক অনু পদার্থ থাকতে তাই দরকার ১০^১৯ অনু জল/পানি। এই অনুপাতে ধরুন আপনি যদি ওষুধ মানে ওই দ্রব্যের এক অনু পেতে চান তা হলে ৩০X এর মাত্রার হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে দুই বিলিয়ন ল্যাকটোজ সুগারের দানা খেতে হবে। ভাবুন!

রসায়নের সূত্র অনুযায়ী (পিনাকী এই বিষয়ে বলতে পারবে আরও ভালো) ডাইলুশনের একটি সীমা আছে, যার বেশী ডাইলুটেড করা হলে দ্রবণে আসল পদার্থটি আর পাওয়া যাবে না। এই সীমাটি অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত এবং ১২C বা ২৪X (১০^২৪ ভাগের এক ভাগ) হোমিওপ্যাথি মাত্রার সমতুল্য। হ্যানিম্যান নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এ ধরণের কাজ করলে ওই তরলে মূল পদার্থের ছিঁটেফোঁটা থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কিন্তু তিনি "বিশ্বাস" করতেন যে প্রতি বার এই ডাইলুশনের সময় ওই মিশ্রনে মূল বস্তুর "আত্মার-মত" এক ধরণের নির্যাস থেকে যায়, যেটা যদিও ওটা পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায় না তবু শরীরের 'প্রাণ শক্তি' আবার জাগিয়ে তোলে। কি সাংঘাতিক !!

সাইলেসিয়া ২০০ খেলে নাকি গলায় ফুটে থাকা মাছের কাঁটা গলে যায়। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ সাইলেসিয়া ২০০ ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে কাঁচের প্লেটে সাইলেসিয়া ২০০ নিয়ে তাতে দিনের পর দিন মাছের একটা ছোট্ট কাঁটা ডুবিয়ে রেখে দেখেছিলেন- কাঁটা লাগা তো লাগা! কিছুই হয়নি।

বস্তুত হ্যানিম্যান এর পরে আর এই নিয়ে কোনও কাজ হয়নি আর করেও লাভ নেই তাই হ্যানিম্যান আজও পুনরায় জীবিত হয়ে নিজের বইয়ের উপর পরীক্ষা দিলে পাস্ করবেন কিন্তু ডারউইন হয়তো ফেল করে যাবেন কারণ পরবর্তীতে যা গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশ জিনিস ডারউইনের জানা নেই। বস্তুতঃ এই চিকিৎসা এক ধরণের প্ল্যাসিবো চিকিৎসা বা ফেইথ হিল মানে স্ব-ইচ্ছায় রোগের উপশম।

তারপরেও এই হোমিওপ্যাথির কেন এখনও জনপ্রিয়তা? কেন লোকে যায়? কারন হল আমাদের এই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানুষ পিছু ডাক্তারের সংখ্যা অতীব কম, এর সাথে আছে ওই মূল ধারার ডাক্তারদের ওষুদের মাত্রা নিয়ে ভুল চিকিৎসা। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ওষুধ না খেলে রোগী নিজেই সেরে যায়। আপনি হাম বা ইনফ্লুয়েঞ্জার ওষুধ বলে কিছু এন্টিবায়োটিক্স দিলে রোগীর উপর আফটার এফেক্ট আসতেই পারে।

একটা কাউন্টার লজিক আসে যে এই হোমিওপ্যাথি এক ধরনের টিকা হিসাবে কাজ করে। না ওটাও ধোপে টিকবে না। কারণ টিকা রোগ ঠেকাতে ব্যবহার হয়, রোগ হওয়ার পরে না। আর টিকায় উপাদানের পরিমান অনেকগুন বেশী এবং হিসেব করে দেওয়া হয়।

১৯৯৭ এ এই কারণে লন্ডন স্বাস্থ্য দফতর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যয়ভার নিতে অস্বীকৃতি জানান। তারা নির্দিষ্ট মানের উপর কোনও সঠিক উত্তর পাননি ওই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের থেকে। হোমিওপ্যাথির ভক্তকুল অল্প কিছু পরীক্ষায় হোমিওপ্যাথির পক্ষে ফলাফল এলেই সেটা দেখিয়ে প্রমান করতে চায় হোমিওপ্যাথি কাজ করে। ক্রমাগত পরীক্ষায় একই ফলাফলের জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। আবার বলছি, প্ল্যাসিবো মানে নকল ওষুধ খেলে কিন্তু বেশী শক্তিশালী হতে পারে। তবে নকল ঔষধ খেয়ে রোগ সারবার সম্ভবনাটার তুলনায় রোগটা না সারবার এবং বিশাল ক্ষতি হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। সেই সাথে রয়েছে আর্থিক ক্ষতি এবং সময় অপচয়। শুরুতে যা বলেছিলাম, ক্যান্সারের মতো রোগ কিন্তু হঠাৎ করে জটিল হয়ে যেতে পারে, সময়মত ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না নিলে। যারা হোমিওপ্যাথি খেয়ে উপকারের কথা বলেন, তারা সেটা না খেয়েও সুস্থ হয়ে যেতেন এমনটা হবার সম্ভাবনাই বেশী।

ভারতে বা বাংলাদেশে এই চিকিৎসার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি আছে সরকারের কাছে। কি আর বলবো ! যা মনে হয়েছে তা হল আধুনিক চিকিৎসক তৈরির খরচ আর ওই চিকিৎসালয় তৈরির বাজেট আমাদের দেশগুলোর নেই ফলে একটা জোড়াতালি ব্যবস্থা, চলছে চলুক! এছাড়াও আর একটা কারণ হল আমাদের সেই 'বিশ্বাস', আমরা বিশ্বাস করি গুরু /পীর অথবা রাজনৈতিক নেতাদের। আমরা ফুল বেলপাতা থেকে প্রাসাদে খুঁজি রোগের ওষুধ। আমরা ওই হোমিওপ্যাথি ওষুধ জার্মানি বা আমেরিকার থেকে তৈরী বলে তা অব্যর্থ ভাবি। তার উপর সরকারীভাবে দেশের মানুষের আয়করের টাকায় কলেজ স্থাপন হয় যখন, জাতীয় হোমিওপ্যাথিক বোর্ড গঠন করে যখন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তখন আর সাধারণ মানুষকে দোষ দেওয়ার কিছু থাকে না।

আবার সেই ক্যান্সার রোগটির কথাই বিবেচনা করি। ক্যান্সার রোগটি ভয়াবহতার দিক দিয়ে এখন বিশ্বের অন্যতম প্রাণঘাতি একটি রোগ। ক্যান্সার যত তাড়াতাড়ি ধরা যায় এবং চিকিৎসা শুরু করা যায়, ক্যান্সার থেকে বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা তত বাড়ে। ওহাইয়ো স্টেইট ইউনিভার্সিটির এক গবেষনায় দেখা গেছে জটিল ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ক্যান্সার ধরা পড়ার দু'মাসের মধ্যে চিকিৎসা শুরু না করলে রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা শতকরা ৮৫ ভাগ। অ্যাপেল কোম্পানীর সিইও স্টিভ জবস জড়িবুটি এবং ব্যতিক্রমধর্মী ঔষধের সেবন করে তার রোগ সারাতে চেয়েছিলেন। নয় মাস এসব টোটকা সেবনের পর তার ক্যান্সার ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে শরীরে। জবসের শেষ পরিণতি তো আমাদের জানাই।

হোমিওপ্যাথির তেমন কোনও সর্বজনগৃহীত স্ট্যান্ডার্ড নেই, এটা কোনও মান নিয়ন্ত্রন পদ্ধতির মধ্যে দিয়েও যেতে হয় না। তাই ভেষজ আর প্রাকৃতিক উপাদানের নামে আসলে কী দেওয়া হচ্ছে আপনাকে সেটা জেনে রাখাই ভালো। ১৭ শতকের হ্যানিম্যানের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও এই আধুনিক যুগে তার আর কার্যকরিতা নেই। সময় এসেছে একটু কঠিন কথাগুলো প্রকাশ্যে বলা।

তথ্যসূত্র :
১. http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/homeo.html
২. https://blog.mukto-mona.com/2009/12/06/3561/
৩. http://www.hpus.com/
৪. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8211925.stm
এবং সিধু জ্যাঠার ভার্চুয়াল রূপ : ইন্টারনেট

বিজ্ঞান কী?

-পার্থপ্রতিম পাল

বিজ্ঞান কী, এই নিয়ে অনেক বিজ্ঞদের মতামত ভিন্ন।
কিন্তু কোনও একটি যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।
তাই নিচের লেখাটির মাধ্যমে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণ করা হল।

বিজ্ঞান কী?

১) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত সৃষ্টি এবং বস্তুগত পরিবর্তনের নিয়মাবলী হল বিজ্ঞান।
কোনও একক ব্যক্তির জানা বা না জানার উপর উক্ত নিয়মনীতি বদলায় না।

২) ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণযোগ্য ও যাচাইযোগ্য, তার সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের নাম বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান শব্দের বিশ্লেষিত রূপ বি+জ্ঞান। 'বি' অর্থ বিশেষ আর 'জ্ঞান' অর্থ সম্যক ধারণা। সুতরাং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ সম্যক ধারণা। এককথায় বিশেষ জ্ঞানই হল বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানীরা বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্ঞান অর্জন করেন এবং প্রকৃতি ও সমাজের নানা মৌলিক বিধি ও সাধারণ সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। বর্তমান বিশ্ব এবং এর প্রগতি নিয়ন্ত্রিত হয় বিজ্ঞানের মাধ্যমে। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাপক অর্থে যে কোনও জ্ঞানের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণকে বিজ্ঞান বলা হলেও আরও সূক্ষ্ম অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হবে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্র মূলত দুটি: সামাজিক বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন সহ এ ধরনের সকল বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

অন্যদিকে মানুষের আচার-ব্যবহার এবং সমাজ নিয়ে যে বিজ্ঞান তা সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।
তবে যে ধরনেরই হোক বিজ্ঞানের আওতায় পড়তে হলে উক্ত জ্ঞানটিকে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে। আর একই শর্তের অধীনে যে গবেষকই পরীক্ষণটি করুন না কেন ফলাফল একই হতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তি চেতনা অনুযায়ী বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষণের ফলাফল কখনও পরিবর্তিত হতে পারে না।

গণিতকে অনেকেই তৃতীয় একটি শ্রেণী হিসেবে দেখেন।
অর্থাৎ তাদের মতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান আর গণিত এই তিনটি শ্রেণী মিলে বিজ্ঞান।
সে দৃষ্টিতে গণিত হল ফরমাল (formal) বিজ্ঞান আর প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞান হল পরীক্ষণমূলক (empirical) বিজ্ঞান।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে গণিতের মিল-অমিল উভয়ই রয়েছে। গণিত এক দিক থেকে পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, উভয়টিই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পদ্ধতিগত অধ্যয়ন করে।
আর পার্থক্য হচ্ছে, পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞানে পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করা হলেও গণিতে কোনও কিছু প্রতিপাদন করা হয় আগের একটি সূত্রের (প্রায়োরিটি) উপর নির্ভর করে।

এই ফরমাল বিজ্ঞান, যার মধ্যে পরিসংখ্যান এবং যুক্তিবিদ্যা ও পড়ে, অনেক সময়ই পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞানে উন্নতি করতে হলে ফরমাল বিজ্ঞানের প্রসার আবশ্যক।

কীভাবে কোনও কিছু কাজ করে (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) বা কীভাবে মানুষ চিন্তা করে (সামাজিক বিজ্ঞান) তা বুঝতে হলে ফরমাল বিজ্ঞানের কাছে হাত পাতা ছাড়া উপায় নেই।

তবে সকলে স্বীকার করেন, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং পরবর্তীতে নতুন নতুন পরিক্ষায় যা বার বার সমর্থিত হয় তাই বিজ্ঞানের সত্য।

ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণযোগ্য ও যাচাইযোগ্য, তার সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের নাম বিজ্ঞান। পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্বে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল, ধ্বংসের পরেও। বিজ্ঞানে অ্যাবসলুট বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানে আজ যা সত্য বলে উদ্ভাসিত, কাল তা বাতিল হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু ঈশ্বরের মডেলে থেমে গেলে সবকিছু ধ্রুবসত্য বলে মানতে হয়। কিন্তু ধ্রুবসত্য বলে তো কিছু নেই।

*বিজ্ঞানসম্মত বলতে কী বোঝায়?

বিজ্ঞানের সকল গুনাবলীর সাথে কোনও তথ্য বা প্রমাণ মিলে গেলে আমরা বলি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাথে সহমত যার তাহাই বিজ্ঞানসম্মত।

*বিজ্ঞানমনস্ক বলতে কী বোঝায়?

যে মানুষ (বিজ্ঞানে তার ডিগ্রী থাকুক বা নাই থাকুক) সংস্কার মুক্ত, সংগঠিত সংশয়বাদী, অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল এবং ধর্মীয় আবেগ ও আপ্ত বাক্য অনুসারে চলেন না তাঁকে বিজ্ঞানমনস্ক বলা হয়।

> “ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর ডিএনএ কিংবা প্রোটিনের মতো কোন ভৌত রূপ হয়তো নেই, কিন্তু অন্য সকল ক্ষেত্রে এটা প্রকৃত ভাইরাসের মতোই কাজ করে।" (বিশ্বাসের ভাইরাস)”
>
> **— অভিজিৎ রায়**

স্বর্গের দাবি মিথ্যা, আকাশজুড়ে গ্রহ নক্ষত্র

-দেবস্মিতা

'ধর্মীয় বুলি নয়, সত্য কেবল বিজ্ঞান'
আজ তাঁর জন্মদিন (১৫ ফেব্রুয়ারি)

আজ থেকে ৪৫০ বছরেরও বেশি আগের কথা। ইতালিতে তখন ধর্মযাজকদের রাজত্ব। সেই সময় ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে পিসা শহরে জন্ম নিলেন এক বালক, বলা ভালো মধ্য যুগের অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এক পথপ্রদর্শক।

ছোটো থেকেই তিনি সব কিছুকে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে বিচার করে নিতেন। তাঁর বাবাও ছিলেন মুক্তমনা, প্রগতিশীল কিছুটা বিদ্রোহীও। এমনকি ছাত্রাবস্থায়ই তিনি পেয়েছিলেন উচ্চকলরবকারী উপাধি। বাবার পুত্র সেরকমই হবে সেটাই স্বাভাবিক। প্রথম জীবনে বাবা আর গৃহশিক্ষকের কাছেই হাতেখড়ি হয় ছেলের। ১৭ বছর বয়সে বাবা, ছেলেকে ডাক্তারি পড়ানোর উদ্দেশ্যে পিসার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করান। কিন্তু ছেলের ছিল গণিত আর দর্শনশাস্ত্রের প্রতি টান। নিজের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অঙ্কের ক্লাসের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি। শিক্ষক কী পড়াচ্ছেন তা শোনার চেষ্টা করতেন। যেটুকু বুঝতেন না, ক্লাসের শেষে শিক্ষক বা ওই ক্লাসের ছাত্রদের ধরে বুঝে নেবার চেষ্টা করতেন। এইভাবেই চলত তাঁর অঙ্ক শেখা। যথারীতি নিজের পাঠ শেষ না করেই এই বালক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরে আসেন।

বাড়ি ফিরে অঙ্ক এবং সাধারন বিজ্ঞানে প্রাইভেট পড়িয়ে তিনি রোজগার করতে শুরু করেন। এইসময়ই তিনি বলেন, 'যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে, বর্গ সংখ্যাও ঠিক ততগুলোই থাকবে।' সংখ্যা ও বর্গ সংখ্যা নিয়ে গ্যালিলিওর এই মতবাদ গণিতের ইতিহাসে একটি বিস্ময় হয়ে রয়েছে। এই মতবাদটি 'গ্যালিলিও কূটাভাস' নামে পরিচিত। বুঝতেই পারছেন আজ কথা বলছি মহান বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলিকে নিয়ে।

তিনি এ সময় তাঁর একটি গবেষণা 'দ্য লিটল ব্যাল্যান্স' প্রকাশ করেন, যার মধ্যে তিনি ছোট ছোট বস্তু পরিমাপের 'হাইড্রোস্ট্যাটিক নীতি' বর্ণনা করেন। তার এই গবেষণা জনপ্রিয়তা পায়। পড়ানোর জন্য ডাক পান পিসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনও ডিগ্রি না নিয়েই গ্যালিলিও চলে গিয়েছিলেন সেই পিসা বিশ্ববিদ্যালয়েই চার বছর পরে ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিন বছরের চুক্তিতে গণিতের শিক্ষক হয়ে ফিরে আসেন তিনি। পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম তৈরি হয়েছিল অ্যারিস্টট্‌লের মতবাদকে ভিত্তি করে। ধারণা নির্ভর এইসব মতবাদের সত্যতা সম্পর্কে গ্যালিলিওর ছাত্রাবস্থা থেকেই সন্দেহ ছিল। ফলে অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে প্রায়ই তাঁর যুক্তিতর্ক বেঁধে যেত। তখনকার সমাজ অ্যারিস্টটল মতবাদকেই শেষ কথা বলে মানত।

অ্যারিস্টটলের মতে, ওপর থেকে একটি ভারী ও হালকা বস্তুকে এক সঙ্গে ফেললে ভারী বস্তুটাই আগে মাটিতে এসে পড়বে। ১০০ পাউন্ড ওজনের কোনও বস্তু এক পাউন্ড ওজনের বস্তুর তুলনায় ১০০ গুণ দ্রুততর বেগে নেমে আসবে। গ্যালিলেও বললেন, তত্ত্বটা ভুল, দুটোই একই সঙ্গে সমান বেগে পড়বে। বহু দর্শকের সামনে পিসার ১৮০ ফুট উঁচু হেলানো টাওয়ার থেকে সমান আয়তনের হালকা ও ভারী ধাতুর বল এক সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে হাতেনাতে সেটা প্রমাণও করে দিলেন। এর পর থেকেই অ্যারিস্টটলের তত্ত্বের খোলাখুলি সমালোচনা শুরু করেন গ্যালিলেও। এতে তিনি কোনওদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সুনজরে এলেন না। তাই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃপক্ষ গ্যালিলিওকে জানিয়ে দেন, তাঁর সঙ্গে আর নতুন করে কোনও চুক্তি করা হবে না।

তিনি ফিরে যান নিজের এলাকায়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে যোগ দেন পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে তিনি বলবিদ্যা, জ্যামিতি এবং জোতির্বিদ্যা পড়াতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ১৮ বছর শিক্ষকতা করেন গ্যালিলিও। এইসময়েই তাঁর

একের পর এক আবিষ্কার শুরু হয়। ১৫৯৩ সালে তিনি থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন। এরপর আবিষ্কার করেন পেন্ডুলাম দোলনের নিয়ম।

হল্যান্ডের এক চশমা ব্যবসায়ী হান্‌স লিপারশে একটি চোঙের দুদিকে দুটো চশমার কাঁচ লাগিয়ে তৈরি করেছিলেন ‘লুকার’ বা ‘দেখার যন্ত্র’। একেই প্রাথমিক টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র বলা হয়ে থাকে। গ্যালিলিও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে সেই দিয়েই মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। আবিষ্কার করলেন বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ, শুক্র গ্রহ সূর্যের চারপাশে ঘোরে এবং সৌরকলঙ্ক। চাঁদে যে, পাহাড় আছে বললেন তাও। স্বর্গ বলে কিছু নেই, সব কাল্পনিক সেটাও জানালেন। আকাশ পর্যবেক্ষণের সকল তথ্য নিয়ে লিখলেন বই, Starry Messenger। এখানেই তিনি অ্যারিস্টটল এবং টলেমির 'পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সব হচ্ছে' এই মতবাদ নস্যাৎ করে দেন। পাশাপাশি কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদকে সমর্থন জানান।

অন্যদিকে, প্রায় একই সময়ে ইংল্যান্ডে হ্যারিয়ট, হল্যান্ডে জন ফ্যাব্রিসিয়াস এবং জার্মানিতে জেসুইট শিনার স্বাধীনভাবে সৌরকলঙ্ক নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। কে সৌরকলঙ্কের আসল আবিষ্কারক সেই নিয়ে বাঁধল ঝামেলা। শেষমেষ আবিষ্কারকের মুকুট ছিনিয়ে নিলেন গ্যালিলিও। এতে তাঁর শত্রু হয়ে উঠলেন বাকিরা।

সৌরকলঙ্ক নিয়ে তিনি প্রকাশ করলেন সবচেয়ে বিখ্যাত বই 'ডায়ালগ' (Dialogue concerning two chief systems of the world)। তাঁর এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়তে থাকে দীর্ঘদিনের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের প্রাসাদ। আগে থেকেই ছিল এবার আরও বেশি করে ধর্মান্ধরা সোচ্চার হতে থাকে তাঁর বিরুদ্ধে। বইটি ছিল বিশ্বকাঠামো সম্পর্কে তিন বন্ধুর সংলাপ। 'ডায়ালগ' বইটি লিখে বাইবেলের অবমাননা করেছেন গ্যালিলিও, শুরু হল এই প্রচার। সেই দলে ছিলেন জেসুইট শিনারও। ইনার সঙ্গেই সৌরকলঙ্কের আবিষ্কার নিয়ে ঝামেলা বেঁধেছিল গ্যালিলিওর। ইনি এই প্রতিশোধের সুযোগ ছাড়বেন কেন!

কথা কানে গেল পোপের। বিতর্ক এমন চরমে পৌঁছল যে গ্যালিলিওকে রোমে ডেকে পাঠানো হল। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ হয় বিজ্ঞানীর এবং তাঁর লেখা সমস্ত বই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা হয়। তখন তিনি প্রায় ৭০ বছরের বৃদ্ধ। এরপর গ্যালিলিওর শেষ জীবন কেটেছে বন্দিদশায়, তাঁর বাড়িতেই। শেষে মৃত্যু হয় সেখানেই।

গ্যালিলিওর বন্দিদশার পরও তাঁর বিজ্ঞান ভাবনা নিয়ে গবেষণা থেমে থাকেনি। তা চলেছে পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে। ধর্ম ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারেনি বিজ্ঞানের সত্যিকে। আজ সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে তিনি যা আবিষ্কার করে গিয়েছেন তার এক কণাও মিথ্যে নয়।

প্রসঙ্গ: সরস্বতী

-দেবস্মিতা

প্রতি বছরই সরস্বতী পুজো নিয়ে চলে মাতামাতি। তরুণ প্রজন্ম কেউ পুরোহিত সাজতে ব্যস্ত আবার কেউ শাড়ির কুচি ধরার লোক খুঁজতে। বলা হয় সরস্বতী বিদ্যার দেবী। কিন্তু কী থেকে তিনি বিদ্যার দেবী হলেন?

আমরা বই পড়ি কিন্তু কোনওটাই মগজে নেই না। ছোট থাকতে সবাই কম বেশি পড়েছি মানুষ যাকে ভয় করতো, ভক্তি করতো তারই পুজো করতো। এই ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। আসলে যে কোনও ঠাকুরের প্রাথমিক ধারণাটাই ওখান থেকে। প্রাচীনকালে (এখন মজে গিয়েছে) সরস্বতী বলে নদী ছিল। প্রাচীন ভারতের অন্যতম সাত নদীর (গঙ্গা, যমুনা, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও সরস্বতী) মধ্যে একটি। তার বিস্তৃতি আদিসপ্তগ্রামের ওপর দিয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দর পর্যন্ত ছিল। মানুষ বিদ্যার্জনের জন্য সেই নদী পেরিয়ে যাতায়াত করত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা। এখান থেকে নদী হয়ে উঠল বিদ্যার দেবী।

পুরাণ নিয়ে ঘাঁটলে উঠে আসে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। সরস্বতীর জন্ম কীভাবে? জানা যায়, ব্রহ্মার কন্যা নাকি সরস্বতী! ব্রহ্মা ধ্যানে বসে সমস্ত গুণ একত্রীভূত করে সৃষ্টি করলেন এক কন্যার। সেই হলো সরস্বতী। বায়োলজিক্যালি মুখ দিয়ে কাউকে সৃষ্টি করা যায় না। যাই হোক, সৃষ্টির পরই মেয়ের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন পিতা। তিনি চাইলেন সেই মেয়ের সঙ্গে যৌনক্রীড়া করতে। ব্রহ্মার দৃষ্টি থেকে বাঁচতে সরস্বতী অন্য দিকে সরে যেতে থাকেন। কিন্তু তিনি যে দিকে সরেন সে দিকেই ব্রহ্মার একটা করে মুখ তৈরি হয়। এই ভাবে ব্রহ্মার পাঁচটা মাথা গজাল। শেষে সরস্বতী রাজহংসীর রূপ ধরে বনে পালিয়ে গেলেন। তাতেও শেষরক্ষা হল না। ব্রহ্মার কাম থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। ব্রহ্মাও রাজহাঁসের রূপ ধরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাহলে কি বাবা - মেয়ের যৌনতা উচিত? পুরাণে কিন্তু সে নিয়ে কোনও যুক্তি নেই। সরস্বতীর ওই রূপই পরবর্তীকালে তার বাহন হয়েছে।

এক পুরাণে পাওয়া যায়, নারদের সঙ্গে দস্যু রত্নাকর (যিনি পরে বাল্মীকি হন) এর দেখা হয়। কথাপ্রসঙ্গে রত্নাকর জিজ্ঞাসা করেন সর্বশ্রেষ্ঠ কে? নারদ রামের কথা বলেন। রত্নাকর যেহেতু দস্যু ছিলেন তাই কিছুতেই 'রাম' উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। 'মরা' উচ্চারণ করেছিলেন বার বার। এমনসময় তিনি দেখতে পান দুই সঙ্গমরত অবস্থায় রাজহাঁসকে। হঠাৎই এক ব্যাধ তীর ছুঁড়লে একটি হাঁসের মৃত্যু ঘটে। এই দৃশ্য দেখে রত্নাকরের মুখ দিয়ে একটা শ্লোক বেরিয়ে আসে। সেটিই সম্ভবত প্রথম শ্লোক বা আদি শ্লোক।

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥'
এর অর্থ কামরত অবস্থায় হত্যা করেছে তাই তার প্রতিষ্ঠা হবে না। বলা হয় সে সময় স্বরস্বতী তার জিভে ভর করেছিলেন। এখান থেকেই আসে সরস্বতী বাক দেবী। বাক অর্থ্যাৎ কথা। প্রসঙ্গত এই শ্লোক এর পর থেকেই রামায়ণের রচনা।
অন্যান্য পুরাণগুলো একটু দেখা যাক। পদ্মপুরাণে সরস্বতী দক্ষকন্যা এবং কশ্যপ পত্নী হিসাবে স্বীকৃত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে সরস্বতী বিষ্ণু বা নারায়ণের পত্নী। আবার শিবপুরাণ আর স্কন্ধপুরাণ মতে সরস্বতী শিবেরও পত্নী। বুঝতেই পারা যায় চরিত্রটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যে যেভাবে পেরেছেন নিজের মত করে গল্প বানিয়েছেন।

এরপর আসি কুল খাওয়ার প্রসঙ্গে। সরস্বতী পুজোর আগে কুল খাওয়া নিষেধ। তার কারণ সেসময় কুল পাকতো না। কাঁচা খাওয়া থেকে আটকাতে বলা হত দেবীকে না দিয়ে কুল খাওয়া যাবে না। দেবীর রোষানলে পড়ার ভয়ে কেউ কুল খেত না। কুল খেলে বিদ্যে হবে না এসব পুরোপুরি ভুলভাল ধারণা। একটি চরিত্র তাঁকে নিয়ে যে যেমন পেরেছেন গল্প বানিয়েছেন, যার কোনও বাস্তব ভিত্তিই নেই। তার পুজো করবেন? মাতামাতি করবেন? নাকি যাতে সত্যি শিশুরা বিদ্যার আলো পায়, বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠে সেই চেষ্টা করবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার হাতে।

মানবিক চেতনা জাগাও প্রাণী হত্যা বন্ধ করুন

-শুভ্রজিৎ
(দশম শ্রেণী)

দুর্বল নিষ্পাপ প্রাণীদের ওপর অত্যাচার, অনাচারের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাড়াতে হবে!
নির্বাক জীব বলে তাদের ওপর অত্যাচার করা হবে,
তাদেরও কষ্ট হয়,
তাদেরও ব্যাথা অনুভূতি হয়,
তাদেরও ব্রেইনের নার্ভ সিস্টেম কাজ করে,
অল্প হলেও তাদেরও বুদ্ধি আছে।

এবার যেটা কথা.... অনেকের রঙিন পাখি, রঙিন মাছ প্রভৃতি পোষার শখ থাকে। আপনার হয়তো এই শখ আছে বা ছিল,আপনিও হয়তো পোষেন। সত্যি কথা বলতে গেলে আমারও এই শখ ছিল, তখন ছোটো ছিলাম (এখনই বা বড়ো কোথায় হয়েছি, এখন আর সেই শখ নেই)।

একবার ভেবে দেখেছেন আপনাকে যদি জন্মের পর থেকে কেউ ছোট্ট খাচায় ভরে রেখে দেয় বা জন্মের পর কয়েকদিন মুক্ত পৃথিবীতে ঘোরার পর কেউ হটাৎ করে খচাই আটকে রেখে দেই; খাচার বাইরে সূর্য উঠছে অস্ত যাচ্ছে, আপনি আলো দেখতে পাচ্ছেন খাচার ভেতর দিয়ে। কিন্তু কখনও সেটা অনুভব করতে পারছেন না, নিজের মতো মন খুলে ঘুরতে পারছেন না এবং আপনি হয়তো জানেন সেই খাচার মধ্যেই হয়তো আপনার মৃত্যু হবে আর কোনওদিনও স্বাধীন হয়ে ঘুরতে পারবেন না। এটা নিশ্চয় আপনার অনাচার মনে হবে। আমি কী বোঝাতে চাইলাম হয়তো বুঝতে পেরেছেন!

রঙিন মাছেদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তারা তো অনেকদূর বিস্তৃত সমুদ্র, নদীতে থাকার মাছ, তাদের যদি ৩ ফুট বা ৪ ফুট (ম্যাক্সিমাম) এর অ্যাকোরিয়ামে রাখা হয়, এছাড়া গোল্ডফিশদের তো ছোট্ট গোল জারগুলোতে রাখা হয় নিজের বাড়ির শোভা বাড়ানোর উদ্দেশে .... তাহলে কি সেটা অনাচার হবে না? কারোর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার আপনি কে?

আমিও পূর্বে ৪*১.৫ এর অ্যাকোয়ারিয়ামে রঙিন মাছ পুষেছি, তখন ছোটো ছিলাম বুঝতাম না অতটা, বাবার কাছে জোর করে দামী দামী মাছ অনিয়েছিলাম (PARROT FISH, BLACK ANGEL আরও অনেক ধরনের রঙিন মাছ ছিল), এগুলো আমার অনেক বড়ো ভুল ছিল যেটা এখন বুঝি। তবে আমাকে ভবিষ্যতের দিকে নজর দিতে হবে, অতীতে তো অনেক ভুল করেছি।" মানুষমাত্রই ভুল হয় এবং সেই ভুল থেকে মানুষ শেখে"। (সত্যি কথা বলতে ভয় কিসের)

অতএব আপনি যদি জানেনও যে ঈশ্বর বলে কেউ নেই এবং আপনার পাপ হবে না তবুও নিজের মানসিকতার খাতিরে মুক্ত করুন এই ধরনের নিষ্পাপ প্রাণীদের। আর ধার্মিক হলে কিছু বলতে পারছি না কারণ, যেকোনও ধর্মে নারীদের যে প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া হয় সেটা আমার জানা আছে; আপনি হয়তো খাচা, অ্যাকোয়ারিয়াম প্রভৃতি জায়গায় প্রাণী বন্দী রাখা জায়েজ মানতে পারেন।

এবার বলা যাক প্রাণী ভক্ষণের ব্যাপারে-
আপনাদের মধ্যে প্রায় সবাই হয়তো ঈশ্বরের সামনে প্রাণীবলি (পাঠাবলি) সমর্থন করেন না (কয়েকজন কট্টর হিন্দুদের দেখেছি যারা সমর্থন করেন এবং নিজেদের কট্টর হিন্দু বলে দাবি করেন)। কিন্তু আসল জীবনে হয়তো নিজেই প্রাণী (মাছ, বিভিন্ন

ধরনের প্রাণীর মাংস ইত্যাদি) ভক্ষণ করেন। তাহলে তো সেই "রাজনীতি করি না" আর "প্রাণীবলি সমর্থন করি না" দুটোয় এক হয়ে গেল।

প্রাণীবলি আর প্রাণী ভক্ষণের মধ্যে পার্থক্য হল প্রাণীবলি ঈশ্বরের সামনে দেওয়া হয় আর প্রাণী ভক্ষণ এর জন্য আপনারা নিজেরা প্রাণী হত্যা করেন না, যারা করে তাদের সেটা জীবিকা অর্থাৎ তার হয়তো সংসার ওটার মাধ্যমেই চলে। এটাই হয়তো পার্থক্য। এছাড়া আপনারা কিনছেন তাই আপনাদেরও সেই প্রাণী হত্যায় সমান ভূমিকা আছে, যদিও আপনি নিজ হাতে করেননি।

সময় বদলাচ্ছে নিজের মধ্যে মানবিক জ্ঞানটা আনতে হবে, আস্তে আস্তে জীবিকাটাও শেষ হতে পারে। যুগ বদলাচ্ছে এবং মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে, কয়েকবছর পর সেই জীবিকা নাও থাকতে পারে।

একটা প্রাণীর পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার আছে এবং আপনি তার জীবন, তার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারেন না। এদের ব্যথা হয়, কষ্ট হয় শুধু আপনাদের মত কথা বলতে পারে না, প্রতিবাদ করতে পারে না (যেমন - ভারতীয়রা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার্থে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর প্রতিবাদ করেছিল, এরা সেরকম করতে পারে না) তাহলে কি তাদের হত্যা করবেন? যুগ যুগ ধরে এই অত্যাচার। সেই পুরোনো যুগ থেকে হয়ে আসছে আগুন আবিষ্কারেরও আগে, কিন্তু তারা প্রতিবাদ করতে পারেনি। "যুগ যুগ ধরে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার লক্ষ্য করা যায়" এটা হয়তো স্কুল বা কলেজ লাইফে মুখোমুখি হয়েছেন অবশ্যই।

খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য তো আরও অনেক কিছু আছে তাহলে এগুলো কেন? যাদের ব্যথা অনুভূত হয় না তাদের প্রয়োজনে খাওয়া যায়, গাছের কথা বলছি।

মশা - মাছি, আরশোলা, ইঁদুর প্রভৃতি এগুলি যতটা পারবেন না-মারার চেষ্টা করবেন। তারা নির্বোধ যতক্ষণ না মারার প্রয়োজন হচ্ছে ততক্ষন মারবেন না। অনেকে আবার পিপড়েদের বিনা দোষেই মেরে ফেলে, এটার কারণও আমি বুঝি না।

আমি নিজেও প্রাণী ভক্ষণ করতাম, এখন প্রায় করি না বললেই চলে, প্রায়টাও কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় আছি। গাছও একটা প্রাণী কারণ আমরা জানি যার প্রাণ আছে তাকেই প্রাণী বলে। তবে প্রয়োজন না পরলে কিছু করা উচিত নয়, তেমন শুধু গাছ থেকে প্রাপ্ত খাবার না খেলে বাঁচবো কী করে? গাছেদের কষ্ট হয় না, ব্যথা হয় না তাই তাদের এবং তাদের থেকে প্রাপ্ত খাবার খাওয়া যেতেই পারে।

যতটা পারবেন আস্তে আস্তে প্রাণীদের কষ্ট দেওয়া কমানোর চেষ্টা করুন, কোনও প্রাণী বন্দী করে রাখলে মুক্ত করুন, চিন্তার মুক্তি ঘটান। হয়তো কাজটা সবার পক্ষে সহজ হবে না। কারণ ছোটবেলাকার শখ এবং অভ্যাস দূর করা খুবই কঠিন, তবুও নিজের পাখির খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে ভাবুন, আমি কি এটা ঠিক করছি! খাওয়ার আগেও ভাবুন কেউ যদি আমাকে এরকম ভাবে খেত! আশা রইলো বুঝতে পারবেন, গুটিকয়েক মানুষ বুঝতে পারবেন বাকিরা নিজেদের মানবিক বলেও এড়িয়ে যাবেন। মানবিক জ্ঞানের প্রসার ঘটুক।

ধন্যবাদ।

খাদ্যে ভেজাল: সচেতন হোন, প্রতিরোধ করুন

–অর্ণব

বর্তমানে খাদ্যে ভেজাল এক ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সর্ষের তেল থেকে শুরু করে ফল-মূল, শাকসবজি, সবেতেই ভেজালের রমরমা। বস্তুত ভেজাল এক আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়, পাশ্চাত্য হোক বা প্রাচ্য, প্রথম বিশ্ব হোক বা তৃতীয় বিশ্ব, সর্বত্র তার বিচরণ। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে জনসচেতনতা কম সেখানে খাদ্যে ভেজাল ধরা ও আটকানো এক কঠিন কাজ। যদিও এ ব্যাপারে দেশে আইনকানুনের কমতি নেই। ভারতবর্ষে প্রাথমিকভাবে ১৯৫৪ সালের খাদ্যে ভেজাল নিরোধক আইন (Prevention of Food Adulteration Act, 1954) দিয়ে ভেজালের মোকাবিলা করা হয়। এই আইন অনুযায়ি কোনও খাদ্যবস্তুতে ভেজাল আছে বলা যায় তখনই যখন-

খাদ্যবস্তুটি যে গুণমানের বলে দাবি করা হচ্ছে সেই গুণমানের না হয়। খাদ্যবস্তুটির কোনও উপাদান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়।

খাদ্যবস্তুটি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কোনও পাত্রে রাখা থাকে। খাদ্যবস্তুটিতে নিজস্ব উপাদানের বদলে নিম্নমানের বা সস্তার উপাদান মেশানো থাকে। খাদ্যবস্তুটিতে কোনও বিষাক্ত উপাদান থাকে। খাদ্যে আংশিকভাবে বা পুরোপুরিভাবে কোনও নোংরা, পচা, রোগযুক্ত প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ উপাদান থাকে। ফলে খাদ্যবস্তুটি খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। খাদ্যবস্তুটিতে অনুমোদিত নয় এমন রঙ মেশানো থাকে। খাদ্যবস্তুটির শুদ্ধতা নির্দিষ্ট মানের নীচে থাকে। খাদ্যবস্তুটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি করা হয় বা রাখা হয়। যার ফলে সেটি থেকে রোগ সংক্রমণের সম্ভবনা থাকে ইত্যাদি।

কৃত্তিম খাদ্য রঙের রমরমা কারবার খাবারে রঙ মেশানোর প্রথা আজকের নয়। এই প্রথার শুরু হয়েছিল সেই ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সময় থেকেই। তবে আগেরকার দিনে খাবারে শুধুই প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করা হত। ১৮৫৬ সালে প্রথম কৃত্রিম খাদ্য রঙ আবিষ্কৃত হয়। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সারা পৃথিবীতে খাদ্য ব্যবসায়ীরা ব্যাপক হারে কৃত্তিম রঙের ব্যবহার শুরু করেন। এর উদ্দেশ্যে ছিল ক্রেতাদের মন জয় করা।

বাজারে বা দোকানে ক্রেতারা খোঁজেন লাল টকটকে টমেটো, ঝকঝকে সবুজ শাকসবজি, লাল দই, রঙীন মিষ্টি, চকচকে মুগ বা মুসুরির ডাল। এখানেই ক্রেতাদের অসচেতনতার সুযোগ নেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। আর কৃত্রিম রঙ মেশানো খাবার খেয়ে প্রতিনিয়ত অসুস্থ হয়ে পড়েন হাজার হাজার মানুষ।

সাধারণভাবে বাড়িতে তৈরি খাবারদাবারে যে সব রঙ ব্যবহার করা হয় সেগুলো হল নিরাপদ প্রাকৃতিক রঙ। সেগুলো নিয়ে অত চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। বাড়িতে মূলত মশলাপাতি দিয়ে খাবারে রঙ আনা হয়। যেমন হলুদ দিয়ে হলদে রঙ, লংকা দিয়ে লাল রঙ। মশলা বিশুদ্ধ হলে এতে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, বরং উপকার আছে। তাই বাড়ির রান্নায় ব্যবহৃত মশলাপাতি বিশুদ্ধ কিনা, সেটা অবশ্যই নিশ্চিত করে নিতে হবে।

বাড়িতে রান্নার সময় খাবারে রঙ আনার আরেকটা উদাহরণ দিই। মাংস রান্নার সময় অনেকে আগে তেলে কিছুটা চিনি ভেজে নেন। এই চিনিটাকে একটু লালচে করে ভেজে নেওয়া হয়। তাতে ঝোলের রঙটা দেখতে আকর্ষণীয় হয়। বাড়ির রান্নাবান্নায় কৃত্রিম রঙ দেওয়ার চল নেই বললেই চলে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অজান্তে কৃত্রিম রঙের পরোক্ষ ব্যবহার হয়ে যেতেই পারে। যেমন, বাজার থেকে কিনে আনা তৈরি খাবার আজকাল আমরা অনেকেই দেদার খাই। সেগুলোতে প্রায়শই কৃত্রিম রঙ প্রচুর পরিমানে মেশানো থাকে। আবার বাজার থেকে কেনা কাঁচা শাকসবজি, মশলাপাতি এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তুতেও কৃত্রিম রঙের ব্যবহার থাকতে পারে। সেগুলার জন্য সতর্ক থাকতে হবে।

অনুমোদিত খাদ্য রঙ

আমাদের দেশে ১৯৫৪ সালে খাদ্যে ভেজাল নিরোধক আইন তৈরি হওয়ার পর থেকে সরকার খাদ্যে কয়েকটি রাসায়নিক রঙ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। আইন অনুযায়ী খাবারের রঙ নিয়ে পরিষ্কার গাইড লাইনও দেওয়া হয়েছে। সেখানে প্রধান দুটো বিচার্য বিষয় হলো:

১) খাবারে যে কৃত্তিম রঙ মেশানো হচ্ছে সেটা অনুমোদিত খাদ্য রঙ কিনা এবং

২) অনুমোদিত রঙ হলে সেটা নির্ধারিত মাত্রায় মেশানো হচ্ছে কিনা

খাদ্যে ভেজাল নিরোধক আইন কতোটা রক্ষিত হচ্ছে সেটা দেখার দায়িত্ব মূলত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন সবাই মিলেই এই ব্যাপারটা পরিদর্শন করে। এজন্য সরকারের নানান কমিটি আছে। দরকার মতো সেই সব কমিটি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় খাবারে কোন রঙ কতোটা ব্যবহার করা ঠিক, আর কতোটা ঠিক নয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে বেশ কিছু রাসায়নিক রঙকে খাবারে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া আছে। এগুলোর মধ্যে আছে লালের জন্য পনকিউ ফোর আর (Ponceau-4 R), কারমোসিন (Carmosine) এবং এরিথ্রোসিন (Erythrosine)। হলুদের জন্য টারট্রাজাইন (Tartrazine) ও সানসেট ইয়েলো (Sunset Yellow)। নীলের জন্য ইনডিগো কারমাইন (Indigo Carmine), ব্রিলিয়ান্ট ব্লু এফ.সি.এফ. (Brilliant Blue FCF)। এছাড়া আছে সবুজের জন্য ফাস্ট গ্রিন এফ.সি.এফ. (Fast Green FCF)।

চাই ক্রেতাদের সচেতনতা

আইন অনুযায়ী খাদ্য বিক্রেতাদের কেবল অনুমোদিত খাদ্য রঙ ব্যবহার করলেই চলবে না, সেটাও করতে হবে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে। যেমন মনে করুন, আইসক্রিম, বিস্কুট, পেস্ট্রি, কোল্ড ড্রিংক্স, ইত্যাদিতে কৃত্তিম রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে প্রতি ১০ গ্রামে সর্বোচ্চ ১ মিলি গ্রাম। আবার মনে করুন, ফ্রুট সিরাপ, স্কোয়াশ, জ্যাম ও জেলি জাতীয় খাবারে প্রতি ১০ গ্রামে সর্বোচ্চ ২ মিলিগ্রাম রঙ দেওয়া যেতে পারে। এই সব খাদ্যবস্তুতে অনুমোদিত মাত্রার থেকে বেশি রঙ মেশানো ভেজালেরই সমার্থক। এর ফলে খাবার থেকে বিষক্রিয়া হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

অনুমোদিত খাদ্য রঙের বাইরে অন্য যে কোনও রাসায়নিক রঙ খাবারে ব্যবহার করা শুধু আইনবিরুদ্ধই নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। ক্রেতাদের কর্তব্য হল বাজার থেকে খাবার কেনার সময় খাবারের প্যাকেটটা খুঁটিয়ে দেখা। সাধারণত প্যাকেটের লেবেলে ব্যবহৃত খাদ্য রঙ সম্পর্কে উল্লেখ করা থাকে। এটা নিয়মের মধ্যেই পড়ে।

এছাড়া মিষ্টির দোকানে বা হোটেল-রেস্তোঁরায় খেতে গিয়ে যদি কারো রঙের ক্ষেত্রে সন্দেহজনক কিছু মনে হয়, দোকানদার বা পরিবেশকের কাছে তাদের খাবারে ব্যবহৃত রঙ সম্পর্কে জানতে চাওয়াটা ক্রেতার অধিকারের মধ্যেই পড়ে। ১৯৮৬ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইনে ক্রেতাদের এই অধিকার দেওয়া হয়েছে।

এখানে আরও একটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সরকারী ভাবে অনুমোদিত কৃত্তিম খাদ্য রঙগুলোও কিন্তু রাসায়নিক খাদ্য রঙ। দীর্ঘদিন ধরে এধরনের রাসায়নিক রঙ মেশানো খাবার বেশি বেশি খেলে শারীরিক ক্ষতির সম্ভবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই সবচেয়ে ভালো হল, রাসায়নিক রঙ মেশানো খাবার যথাসম্ভব না খাওয়া, কেবলমাত্র প্রাকৃতিক খাদ্যরঙ যুক্ত খাবারই গ্রহণ করা।

খাদ্যবস্তুতে বিষের বিপদ

সুগন্ধ আনতে কিংবা পচন রোধ করতে কিংবা উৎপাদন বাড়াতে বাজারি খাবারদাবারে প্রায়শই নানান বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়, যেগুলো মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে রীতিমতো বিপজ্জনক। কয়েকটা উদাহরণ দিতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

➤জ্যাম, জেলি, মাখন, চিজ, ইত্যাদিতে জীবাণু বৃদ্ধি ঠেকানোর জন্য বহু ক্ষেত্রে বেঞ্জোয়েট জাতীয় যৌগ ব্যবহার করা হয়। এ থেকে মাথা ও বুক ব্যাথা এবং ঘাড়ের যন্ত্রণা হতে পারে।

➤পচন রোধের উদ্দেশ্যে অনেকসময় বাজারের কাঁচা মাংসে সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয়। এ থেকে শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, এমনকি পাকস্থলীর ক্যান্সারও হতে পারে।

➤কাটা ফল ও সবজিকে দীর্ঘসময় তাজা দেখানোর জন্য অনেক সময় সালফেট ও সালফাইড জাতীয় যৌগ ব্যবহার করা হয়। এ থেকে অ্যালার্জি হতে পারে।

➤আইসক্রিম, ঠান্ডা পানীয়, স্কোয়াশ, চকোলেট, ইত্যাদি মিষ্টি জাতীয় খাবারে প্রায়শই স্যাকারিন ও অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। এগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকারক।

➤বাজারে প্রতিদিন যে টন টন ছানা আসছে মিষ্টি তৈরির জন্য, বহু ক্ষেত্রেই তা সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে কাটানো দুধ থেকে তৈরি করা। এই অ্যাসিড দিয়ে কাটানো দুধের ছানা বেশি সময় টাইট থাকে। মিষ্টির মাধ্যমে সালফিউরিক অ্যাসিড যুক্ত ছানা চলে যাচ্ছে খাদ্যরসিক ক্রেতাদের পেটে।

সরষের তেলে শিয়ালকাঁটার তেল ভেজাল দেওয়ার কাহিনী বেশ পুরোনো। এছাড়াও সর্ষের তেলে পেট্রোলিয়াম জাত খনিজ তেল ট্রাইক্রিসাইল ফসফেট ভেজাল দেওয়ার ঘটনা বহুবার শোনা গেছে। ১৯৮৮ সালে কলকাতার বেহালা অঞ্চলে যে ভেজাল সর্ষের তেল খেয়ে বহু মানুষ পঙ্গু হয়ে গেছিলেন তাতে ট্রাইক্রিসাইল ফসফেট ভেজাল দেওয়া হয়েছিল।

নিষিদ্ধ রঙ হইতে সাবধান

বাজারে অনেক সময় অসাধু ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের ঠকাতে ছোলার ডাল, মুগ ও মুসুর ডাল, গুঁড়ো বা গোটা হলুদ, মিষ্টি ইত্যাদিতে মেটানিল ইয়েলো রঙ মিশিয়ে বিক্রি করে। আবার শুকনা লংকা, রাঙা আলু, জ্যাম, জেলি, সস, লজেন্স, চকোলেট, আইসক্রিম ইত্যাদিতে লাল রঙ আনতে অনেকে নিষিদ্ধ কঙ্গো রেড রঙ ব্যবহার করে। এইসব রঙের বিষক্রিয়ায় মস্তিষ্ক, মূত্রাশয় ও চোখে ক্ষত তৈরি হতে পারে।

খাদ্যবস্তুতে উজ্জ্বল লাল রঙ আনতে আরেকটি নিষিদ্ধ রঙের ব্যবহারও বাজারে চালু আছে। তার নাম রোডামাইন বি। রোডামাইন বি-এর কারণে মূত্রাশয়, যকৃত ও প্লীহাতে ক্ষত তৈরি হতে পারে। এমনকি ক্যানসার হওয়ারও সম্ভবনাও থাকে।

অবৈধ রঙের কারবার থেকে আমাদের চিরপরিচিত মুড়িও আর মুক্ত নয়। আজকাল মুড়ি ধবধবে সাদা এবং আকারে বড় করার জন্য বহু উৎপাদক দেদার ইউরিয়া মেশাচ্ছে। এমনিতে ইউরিয়া প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু মুড়ির সাথে বেশি মাত্রায় ইউরিয়া শরীরে গেলে নানা অসুবিধে তৈরি হতে পারে। কিডনির সমস্যা হতে পারে।

সবুজ শাকসবজি, যথা, পটল, ঢেঁড়শ, উচ্ছে, বিনস,মটরশুঁটি ইত্যাদিকে তরতাজা দেখাতে অনেক সময় অসাধু বিক্রেতারা নিষিদ্ধ ম্যালাকাইট গ্রিন রঙ ব্যবহার করে। এই রঙ-এর জন্য মূত্রাশয়, কিডনি, যকৃত ও প্লীহাতে বিভিন্ন রোগ, বিশেষ করে টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সবজিতে নিষিদ্ধ ম্যালাকাইট গ্রিন রঙ দেওয়া হয়েছে কিনা তা বোঝার একটা সহজ উপায় আছে। খানিকটা তুলো তরল প্যারাফিন বা নারকেল তেলে ভিজিয়ে তা দিয়ে সবজির খোসা কয়েকবার ঘষুন। যদি তুলোটা সবুজাভ হয়ে যায়, তাহলে বুঝবেন সবজিতে নিষিদ্ধ রঙ ব্যবহার করা হয়েছে।

এবারে চায়ের কথায় আসি। একটা ভেজা সাদা কাগজের ওপর বাজার থেকে কিনে আনা চা পাতা ছড়িয়ে দিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাগজের ওপর লালচে ছোপ ফুটে উঠলে বুঝবেন আপনার চায়ে ভেজাল আছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা চা পাতায় প্রায়ই কোলটার ডাই মিশিয়ে থাকে। এটাও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

ঠান্ডা জলে চা পাতা দিলে সাধারণত কোনও রঙ বেরোনোর কথা নয়। যদি বেরোয়, তাহলে আপনি সন্দেহ করতেই পারেন যে সেই চা পাতায় রঙ মেশানো আছে। এটা চা পাতা ভালো কি মন্দ, বোঝার একটা সহজ উপায়।

খাদ্যে নিষিদ্ধ রঙ ধরার কিছু সহজ পরীক্ষা

1. বাজারের শাকসবজি তরতাজা দেখানোর জন্য অনেকসময় বিক্রেতারা ম্যালাকাইটগ্রিন নামের নিষিদ্ধ রঙ ব্যবহার করে। এই রঙ ধরার সহজ উপায় হলো খানিকটা তুলো তরল প্যারাফিনে ভিজিয়ে তা দিয়ে সবজির খোসা ঘষতে হবে। যদি তুলোটা সবুজাভ হয়ে যায়, তাহলে বোঝা যাবে সবজিতে নিষিদ্ধ রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া সবজির বোঁটার দিকটা লক্ষ্য করেও নিষিদ্ধ রঙের উপস্থিতি ধরা যায়। সাধারণভাবে সবজির বোঁটা হওয়া উচিত হালকা সবুজ বা ধূসর বর্ণের। কিন্তু রঙে চোবানো সবজির বোঁটাও হবে ঘন সবুজ। বাজার থেকে এধরনের সবজি কেনা উচিত নয়।

2. মিষ্টি, শুকনা লংকা, রাঙা আলু, জ্যাম, জেলি, সস, লজেন্স, চকোলেট, ইত্যাদিতে নিষিদ্ধ লাল রঙ কঙ্গো রেড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা ধরার জন্য কাজে লাগাতে হবে মিউরিয়েটিক অ্যাসিড। সন্দেহজনক খাদ্যবস্তু জলে গুলে তার মধ্যে মিউরিয়েটিক অ্যাসিড যোগ করুন। কঙ্গো রেড থাকলে জলীয় দ্রবণের রঙ লাল থেকে নীল হয়ে যাবে।

3. মাছের কানকোতেও নিষিদ্ধ কঙ্গো রেড রঙ ব্যবহার করার রীতি আছে। দেখে মনে হয় যেন রক্ত। সত্যিকারের রক্ত হলে বার বার জল দিয়ে ধুলে চলে যায়। কিন্তু কঙ্গো রেড হলে বারবার ধোয়ার পরেও লাল রঙ থেকে যায়।

4. সিরাপ, জ্যাম, জেলি, সস, করমচা, আইসক্রিম, লজেন্স, শুকনো লংকা বা রাঙা আলুতে লাল রঙ আনতে আরেকটা নিষিদ্ধ রঙের ব্যবহার চালু আছে যার নাম রোডামাইন বি। এই রঙ ধরার জন্য আগের মতো প্যারাফিন বা নারকেল তেলে তুলো ভিজিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। তুলো লালাভ বর্ণ ধারণ করলে বুঝবেন খাদ্যে নিষিদ্ধ রোডামাইন বি রঙ আছে।

5. মুড়িতে ইউরিয়া আছে কিনা সেটাও আপনি ঘরোয়া রাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্যে সহজেই ধরতে পারেন। খানিকটা মুড়ি নিয়ে অল্প জলে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ছেঁকে জলটা সংগ্রহ করে তাতে কয়েক ফোঁটা ফিনলপথ্যালিন মেশান। জলীয় দ্রবণটা হালকা গোলাপী বর্ণ ধারণ করলে বুঝবেন মুড়িতে ইউরিয়া আছে। ফিনলপথ্যালিন না পেলে লাল লিটমাস পেপার দিয়েও এই পরীক্ষা করা যাবে। লাল লিটমাস ওই দ্রবণে ডোবালে যদি নীলাভ রঙ নেয়, তাহলে বুঝবেন আপনার মুড়িতে ইউরিয়া আছে।

6. খাদ্যে সুগন্ধ আনতে আমরা অনেকসময় যে হিং ব্যবহার করি তাতে ভেজাল হিসেবে গদ, রেজিন, এমনকি নিষিদ্ধ রঙও মেশানো হয়। হিং খাঁটি হলে একে জলে গুললে দুধের মতা সাদা মিশ্রণ তৈরি হবে। তাছাড়া খাঁটি হিং আগুনে দিলে উজ্জ্বল শিখায় জ্বলতে থাকে। এই দুটো ক্ষেত্রেই অন্যরকম কিছু ঘটলে বুঝবেন আপনার হিং-এ গন্ডোগোল আছে। ওই হিং খাবারে ব্যবহার করা নিরাপদ নাও হতে পারে।

দুধের ভেজাল ধরবেন কীভাবে?

আমাদের খাদ্য তালিকায় দুধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেহের প্রায় সব প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানই দুধের মধ্যে রয়েছে। তাই দুধকে বলা হয় সুষম খাদ্য। দুধ থেকে প্রচুর পরিমানে দুগ্ধজাত খাদ্য তৈরি হয়। যেমন, পনির, ছানা, রসগোল্লা, সন্দেশসহ বহু ধরনের মিষ্টি, আইসক্রিম ইত্যাদি।

ইদানিং খোলা বাজারে এমন অনেক গুঁড়ো দুধ, প্যাকেটজাত দুধ, পনির, ছানা, খোয়া ক্ষীর বিক্রি হচ্ছে যেগুলোর FSSAI এর ছাড়পত্র নেই। এগুলোর অধিকাংশই নিম্নমানের। অবশ্য FSSAI ছাড়পত্র থাকলেই যে সেই দুধ বা দুগ্ধজাত খাদ্য ভেজাল মুক্ত হবে চোখ বুঁজে এমন ধরে নেওয়ারও কোনও কারণ নেই।

বাজারে ভেজাল দুধ তৈরি করতে জলের সঙ্গে মেশানো হয় সাদা রঙের সস্তা ভোজ্য তেল, চিনি, ইউরিয়া, ডিটারজেন্ট পাউডার, ইত্যাদি। আসুন আজ আমরা জেনে নিই, দুধের নানা ভেজাল কীভাবে হাতে কলমে পরীক্ষা করে সহজেই ধরে ফেলা যায়।

দুধে ইউরিয়া

এক কাপ দুধে ১ চামচ অড়হর ডালের গুঁড়ো মিশিয়ে কয়েক মিনিট রাখুন। এরপর তাতে লাল লিটমাস ডোবালে যদি রঙ নীলচে হয়ে যায় তবে বুঝবেন দুধে ইউরিয়া আছে।

দুধে চিনি

ভেজাল দুধে মিষ্টত্ব আনতে চিনি বা বাতাসা মেশানো হয়। ১০০ মিলি দুধে ৪০ মিলি ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সহ ১ গ্রাম রিসরসিনল মিশিয়ে গরম করুন। দ্রবণটির রঙ যদি লাল হয়ে যায় তাহলে বুঝবেন দুধে চিনি বা বাতাসা মেশানো হয়েছে।

দুধে নিষিদ্ধ রঙ

ভেজাল দুধে হলুদ রঙ আনতে অনেক সময় নিষিদ্ধ মেটানিল ইয়েলো রাসায়নিকটি মেশানো হয়। বিশেষ করে মোষের দুধে জল মিশিয়ে মেটানিল ইয়েলো প্রয়োগে হলদেটে ভাব তৈরি করে গরুর দুধ বলে বেচে দেওয়া হয়। শুধু দুধে নয়, দুগ্ধজাত খাদ্য, যেমন, রসগোল্লা, ছানা, সন্দেশ, বরফি বা খোয়াতেও প্রায়শই মেটানিল ইয়েলো মেশানো হয়।
এ ধরনের দুধ বা দুগ্ধজাত খাদ্যে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করলে তার রঙ বদলে লালচে-বেগুনী হয়ে যাবে। মেটানিল ইয়েলো না থাকলে দুধের স্বাভাবিক রঙ বজায় থাকবে।

বিপদের নাম আজিনামোটো

আজিনামোটো এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যার বৈজ্ঞানিক নাম মোনোসোডিয়াম গ্লুটামেট। এটা হলো এক প্রকার গন্ধ-বর্ধক বা ফ্লেভার এনহ্যান্সার। অর্থাৎ, এর নিজের কোনও গন্ধ নেই কিন্তু এটা অন্য গন্ধকে বাড়াতে সাহায্য করে। চাইনিজ ও জাপানিজ খাবারে আজিনামোটো বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আজিনামোটো যুক্ত খাবার নিয়মিত বেশি পরিমানে খেলে পরিপাকের নানা সমস্যা দেখা দেয়। আজিনামোটোর কারণে ‘চাইনিজ রেস্তোরা সিনড্রোম’ নামের এক রকম রোগ হয়। যার ফলে প্রথম প্রথম গা-হাত-পা-ঘাড়ে ব্যথা হয়। পরের দিকে গায়ের চামড়া ঝুলে যায়। অল্প বয়েসেই বৃদ্ধদের মতো দেখতে লাগে।

আজিনামোটো যুক্ত খাবার সকলেরই পরিহার করা উচিত। বিশেষ করে, শিশুদের খাবারে আজিনামোটো দেওয়া একেবারেই ঠিক নয়। সন্তান সম্ভবা মহিলাদেরও আজিনামোটো এড়িয়ে চলা ভালো। আজিনামোটো মস্তিষ্কের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। ফলে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। আজিনামোটো তো বটেই, বাজারে চালু নুডলস মশলাও আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত।

পরিচিত খাদ্যের প্রচলিত ভেজাল

ঘি-র ভেজাল

বনস্পতি বা ডালডায় কৃত্তিম গন্ধ যুক্ত করে 'ঘি' নামে বিক্রি করার গল্প খুবই পুরোনো। এধরনের নানান ভেজাল 'ঘি' দেশের বহু 'কারখানায়' প্রতিদিন হাজার হাজার কেজি তৈরি হচ্ছে। এই সব তথাকথিত 'ঘি' শুধু যে নিম্নমানের তাই নয়, এগুলো রীতিমতো বিপজ্জনক অর্থাৎ এগুলো খেলে যেকোনও লোক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে এমন কিছু সহজ পরীক্ষা আছে যেগুলোর মাধ্যমে আপনি বাজারি ঘি-র কয়েক রকম চালু ভেজাল ধরতে পারেন।

বাড়িতে একটা টেস্টটিউব জোগাড় করে কিছুটা ঘি (বা মাখন) নিন। তাতে ১ চামচ ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) অ্যাসিড ও সামান্য চিনি যোগ করে মিশ্রণটাকে সামান্য গরম করে ঝাঁকান। কিছু সময় পরে মিশ্রণের নীচের স্তর গাঢ় খয়েরি রঙ ধারণ করলে বুঝবেন আপনার ঘি-র নমুনায় ডালডা বা বনস্পতি মেশানো আছে।

ঘি গলিয়ে তার মধ্যে একটুখানি টিংচার আয়োডিন যোগ করুন। মিশ্রণটা নীলবর্ণ ধারণ করলে বুঝবেন ঐ ঘি-তে আলুসেদ্ধ মেশানো আছে।

ডাল ও জিরেতে ভেজাল

নকল ডাল ও জিরের কারবার বর্তমানে রমরম করে চলছে। এক্ষেত্রে প্রথমে মাটির সঙ্গে সিমেন্ট মিশিয়ে বড়ো বড়ো তাল তৈরি করা হয়। সেগুলোকে রোদে খানিকটা শুকিয়ে নিয়ে লোহার জালে ঘষা হয়। জালের ছিদ্র বিভিন্ন আকারের হয়। এই পদ্ধতিতে তৈরি হয় নকল মুসুর ডাল বা কালো জিরের দানা। সব শেষে সেগুলো সোনালি মেটানিল ইয়েলো রঙে ডুবিয়ে দিলেই হয়ে যায় মুসুরি ডাল। কিংবা পোড়া মোবিল মাখিয়ে তৈরি হয় কালো জিরে। সস্তায় ঐ নকল ডাল বা জিরে কিনে কিছু অসাধু ব্যবসায়ি ভালো ডাল বা জিরের সাথে পাইল দিয়ে বিক্রি করে বিভিন্ন বাজারে। দেশের বহু জায়গায় এভাবেই ভেজাল চক্রের ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে।

আলুতে রঙ

আলু বর্তমানে আমাদের সার্বজনীন খাবার। প্রায় সব রান্নাতেই আমাদের আলু চাই। আলু দিয়ে যে কতরকম স্পেশাল আইটেম হয় তা বলে শেষ করা যাবে না। আলুর দম, আলু-চানা, আলু পোস্ত, আলু-মটর, আলু-কাবলি, আলু চোখা, আলু ভাজি, আরো কতো কি। দুঃখের বিষয় সেই আলুতেও মেশানো হচ্ছে নানান ভেজাল। আলুতে ইটের গুঁড়ো, এলা মাটি সহ নানান লাল ও হলুদ রঙ মেশানো এখন বলতে গেলে ওপেন সিক্রেট। এই সব ভেজাল ও রঙ যুক্ত আলু খেলে অ্যালার্জি তো হতে পারেই, উপরন্তু হতে পারে কিডনি ও পেটের রোগ সহ নানা ধরনের রোগ।

চকচকে সবজি ও ফলে রঙ

বাজারের চকচকে বেগুন মানেই যে টাটকা ভালো বেগুন তা নাও হতে পারে। পোড়া মোবিল মাখিয়ে যে ঐ বেগুনকে চকচকে করা হয়নি তা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যাবে না। ইদানিং আপেল ও অন্যান্য ফলে এক ধরনের রঙ পালিশ করে চকচকে করা হচ্ছে। এই রঙ শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। পটল, করলা ও অন্যান্য সবজিও তুঁতের জলে রঙ করা হয় উজ্জ্বল সবুজ রাখার জন্য।

নকল আমলকি ও চেরি

ট্রেনে, বাসে আমলকির প্যাকেট আজকাল দেদার বিক্রি হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এইসব আমলকির কুচির রঙ হয় কুচকুচে কালো। কাঁচা আমলকি রোদে শুকালে তার রঙ এতোটা কালো হওয়ার কোনও কারণ নেই। আসলে অনেক সময়ই ডুমুরকে ফালি করে কেটে বীটলবণ ও সাইট্রিক অ্যাসিডে ভিজিয়ে রেখে, পরে শুকিয়ে আমলকি বলে বিক্রি করা হয়।

আবার বাজারে যে লাল টকটকে চেরির প্যাকেট বিক্রি হয় তা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো আদৌ চেরিফল নয়। আসলে কাঁচা করমচা চিনির রস ও কৃত্তিম লাল রঙ রডোমিন-বি এর দ্রবণে চুবিয়ে রেখে চেরি বলে বিক্রি করা হয়।

খাবারে প্রিজারভেটিভ

খাদ্যবস্তুর শেল্ফ লাইফ বাড়ানোর জন্য তাতে যেসব পদার্থ মেশানো হয়, তাদের বলা হয় ফুড প্রিজারভেটিভ। এই ফুড প্রিজারভেটিভদের আবার দুটো শ্রেণী আছে। ক্লাস ওয়ান এবং ক্লাস টু। ক্লাস ওয়ান প্রিজারভেটিভের মধ্যে পড়ে সাধারণ চিনি, লবণ, গ্লুকোজ, ইত্যাদি। ক্লাস টু প্রিজারভেটিভের উদাহরণ, নানান রাসায়নিক পদার্থ, যেমন, সালফার ডাইঅক্সাইড, সোডিয়াম বেনজোয়েট, সোডিয়াম মেটাসালফাইড, পটাসিয়াম নাইট্রেট, ইত্যাদি।

বিভিন্ন খাদ্য বস্তুর মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য বাজারে শত শত প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয়। এর অনেকগুলোই প্যাকড ফুড বা টিনজাত খাবারে ব্যবহার করা হয়। বহু ক্ষেত্রেই এগুলো স্বাস্থ্যসম্মত নয়, বরং বেশ ক্ষতিকারক।

এমন একটা ক্ষতিকর প্রিজারভেটিভ হলো সোডিয়াম বেনজোয়েট। এটা ফলের রস, আচার, জ্যাম, এমনকি ওয়াইন ও বিয়ারেও ব্যবহার করা হয়। ভারতে এটা নিষিদ্ধ হলেও বাজারে এর ব্যবহার চালু আছে। কারও কারও ক্ষেত্রে, এটা অ্যালার্জির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রিজারভেটিভ যুক্ত খাবার খেয়ে অনেকের বমিভাব বা পেটে ব্যাথা দেখা দেয়। এই রাসায়নিকের প্রভাবে মাথা ব্যথা ও শ্বাসের সমস্যাও হতে পারে।

আর একটা প্রচলিত প্রিজারভেটিভ হলো স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। এর ব্যবহার বাচ্চাদের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর। পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট, পাস্তা, পেস্ট্রি, নুডলস, ইত্যাদিতে প্রোপিওনেট জাতীয় এক ধরনের প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয়, যার পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে সামান্য তেতো-তেতো ভাব আসে। অতিরিক্ত প্রোপিওনেট যুক্ত খাবার খেলে কিডনির কার্যকলাপ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাছাড়া এ থেকে ক্যানসার হওয়ার সম্ভবনাও বেড়ে যায়।

সাধারণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে খাদ্যে ক্ষতিকারক প্রিজারভেটিভদের উপস্থিতি ও পরিমান চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। অতএব প্রিজারভেটিভ যুক্ত প্যাকড ফুড বা বাজারি খাবার যথা সম্ভব কম খেয়ে ঘরে রান্না টাটকা খাবারদাবার বেশি বেশি খাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অস্বাস্থ্যকর ভেজাল খাবার খেলে কী হয়?

ভেজাল বা নিম্নমানের খাবার এক আধবার খেলে বা অল্প পরিমানে খেলে হয়তো তেমন বড়ো কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। অবশ্য সেটাও খাবারের মধ্যে থাকা টক্সিসিটি বা বিষক্রিয়ার পরিমাণের ওপর নির্ভর করবে। আসলে এই টক্সিসিটি দু ধরনের হয়। এক, অ্যাকিউট টক্সিসিটি বা তীব্র বিষক্রিয়া। এই ধরনের বিষক্রিয়ায় শরীরে বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করার পর দ্রুত (২৪ ঘন্টার মধ্যে) শারীরিক ক্ষতি হতে দেখা যায়। যেমন, বমি, মাথাঘোরা, দ্রুত রক্তচাপ বৃদ্ধি, পঙ্গুত্ব, ইত্যাদি। দুই, ক্রনিক টক্সিসিটি বা দীর্ঘমেয়াদি বিষক্রিয়া। এই ধরনের বিষক্রিয়ায় শরীরে বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করার সাথে সাথে ক্ষতির লক্ষণ প্রকাশ পায় না। যতদিন যেতে থাকে, ধীরে ধীরে এই বিষক্রিয়ার ফল প্রকাশ পায়। যেমন, ধীরে ধীরে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, চোখের দৃষ্টি কমে, শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি হয়, হৃদরোগ দেখা দেয়, কিডনি বিকল হয়ে পড়ে, লিভারের ক্ষয় হয়, ইত্যাদি। ভেজাল ও রাসায়নিক বিষ-প্রভাবিত খাদ্য নিয়মিত খেলে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির হাত থেকে বাঁচা প্রায় অসম্ভব।

ভেজাল খাদ্য বন্ধে আমাদের কী করণীয়?

ভেজাল খাদ্যের রমরমা কারবার বন্ধ করতে দরকার সর্বাত্মক সামাজিক উদ্যোগ। প্রথমেই ভেজাল সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়ানো দরকার। ভেজাল প্রতিরোধে প্রশাসনকেও তৎপর হতে হবে। প্রতিটি ব্লক ও পৌর এলাকায় খাবারের নমুনা দোকান থেকে সংগ্রহ করে উন্নত মানের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করতে হবে এবং দ্রুত রিপোর্ট প্রকাশ করে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। ভেজাল সংক্রান্ত মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটিয়ে ভেজালদাতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এর জন্য দরকার হলে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

প্রতিটা মানুষকে ভেজাল রোধে ব্যক্তিগত স্তরেও উদ্যোগী হতে হবে। এর জন্য রাসায়নিক সার ও বিষ বর্জিত, ভেজালমুক্ত খাদ্য সংগ্রহে জোর দিতে হবে। কৃত্তিম রং মেশানো খাবার, জাঙ্ক ফুড, প্যাকেজড ফুড, ইত্যাদি বর্জন করতে হবে। স্বাস্থ্যই যে সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, এবং ভেজালমুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যই যে সুস্বাস্থ্যের অন্যতম শর্ত, সেটা আমাদের সবারই মনে রাখা দরকার।

হিজাব, একটি বিতর্ক এবং..

-অভিষেক

ফেব্রুয়ারি ২০২০-এর প্রথম সপ্তাহ থেকে হিজাব নিয়ে বিতর্কে সরগরম কর্ণাটক। ঘটনার সূত্রপাত অবশ্য সপ্তাহ খানেক আগে। কর্ণাটক রাজ্যের উদুপি জেলায় একটি সরকারি কলেজে ছয়জন ছাত্রীকে হিজাব পরে ক্লাস করতে বাধা দেওয়ায় শুরু হয় বিতর্ক। সেই ঘটনায় আদালতের দ্বারস্থ হন একজন ছাত্রী। পরে বিতর্কের আঁচ ছড়িয়ে পড়ে আরও কয়েকটি কলেজে। অন্যদিকে গত ৩ ফেব্রুয়ারী ২০২২ (বৃহস্পতিবার) ওই জেলার সৈকত-শহর কুন্দাপুরের একটি কলেজে হিজাব পরে আসা কয়েক জন জন ছাত্রীকে ক্লাস করতে বাধা দেওয়া হয়। ছয় ঘণ্টা ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁরা। শুক্রবারও একই ভাবে তাঁদের ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে চারটে ঘটনার ভিডিও। একটিতে দেখা গেছে, শ'খানেক ছাত্র গেরুয়া শাল পরে একজন বোরখা পরিহিত মুসলিম তরুণীকে "জয় শ্রীরাম" স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে এবং সেই তরুণীটি পাল্টা "আল্লাহ্ আকবর" স্লোগান দিচ্ছে। দ্বিতীয় ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে কর্নাটকের একটি স্কুলে গেরুয়া পতাকা উত্তলন করছে রামের নামে স্লোগান দেওয়া একজন তরুণ। তৃতীয় ভিডিওতে, একটি বন্ধ ক্লাসরুমের বাইরে বেশকয়েকজন উত্তেজিত যুবকেদের "জয় শ্রীরাম" স্লোগান ও দরজা খুলে দিলে তাদের হুড়মুড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ। চতুর্থ ভিডিওতে দেখা গেছে, রাস্তা দিয়ে যাওয়া কয়েকজন বোরখা পরিহিত তরুণীদের উদ্দ্যেশ্যে একদল যুবকেরা জল ছুঁড়ে দিচ্ছে।

এইমূহুর্তে অন্য কিছু আলোচনা কোথায় যেন হাওয়া। পাড়ার চায়ের দোকান থেকে সোশ্যাল মিডিয়া, মাছবিক্রেতা মন্ডলদা থেকে বাড়ির পরিচারিকা মুন্নির এখন একটাই প্রধান ইস্যু -"হিজাব"। ওদিকে, সারাক্ষণ আতঙ্কে থাকা এবং আতঙ্কে রাখা মিডিয়াতেও করোনাতঙ্ক ভ্যানিশ হয়ে হিজাব বিতর্কটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। শুরুতে যে ঘটনাটা উল্লেখ করেছি সেটা খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার, হটাৎই স্মরণে এলো বলেই লিখলাম। কিন্তু কোথাও যেন এই হিজাব বিতর্কের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। আমি কি পোশাক পরবো, কি বই পড়বো, কোথায় ঘুরবো, কি খাবো কিংবা কি দেখবো অথবা শুনবো সেটা সম্পূর্ণ আমার অথবা একজন ব্যক্তিনির্ভর ব্যাপার। এতে কেউই হস্তক্ষেপ করতে পারেনা অথবা জোর করে কিছু চাপিয়েও দিতে পারেনা।

ইসলামধর্মাবলম্বী পরিবারের কোনো মহিলা যদি স্ব-ইচ্ছায় হিজাব কিংবা বোরখা পরিধান করতে চান তাহলে ব্যাপারটা আলাদা কিন্তু কোনো মহিলাকে জোর করে উক্ত জিনিস দুটো পরিধান করানো কিন্তু অবশ্যই নিন্দনীয়। তাছাড়া একটা বাস্তব সত্যি হচ্ছে, বোরখা কিংবা হিজাব মধ্যযুগীয় কু-প্রথা এবং অবশ্যই কট্টর পুরুষতান্ত্রিক। আমার পরিচিত একজন দিদি সোশ্যাল মিডিয়াতে ঠিক এমনই কিছু লিখেছিলেন সম্প্রতি। দেখলাম, সেখানে একজন বাংলাদেশের মুমিন ব্যক্তি কমেন্টে লিখেছে - " ও হিন্দুম্যাডাম, এসব ডায়লগ নিজের বাড়িতে বসে ঝাড়ুন গে। আপনি বিকিনি পরে কিংবা উলঙ্গিনী হয়ে ঘুরতে ভালোবাসতে পারেন, তবে আমাদের ইসলাম একে মান্যতা দেয়না। শুধু চোখ দুটি ছাড়া নারীকে পর্দানশীন রাখা ইসলামের অঙ্গ। তাই না জেনে উল্টোপাল্টা লিখবেন না। আমাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার আপনি কে হে? "।

প্রিয় বন্ধুরা, লক্ষ্য করুন এই ব্যক্তির বক্তব্য যা অনেককিছুই স্পষ্ট করে দিচ্ছে। যারা নারীকে সম্মান জানতে পারেনা, যাদের কাছে একজন নারী শুধুমাত্র "মানুষ" না হয়ে, ভোগের সামগ্রী হয়ে ওঠে, যারা নারীকে শিক্ষার আলো থেকে শতহস্ত দূরে রেখে নিজেদের বানানো আইনে শৃঙখলাবৃত করে রাখতে পছন্দ করে তারা চাইবেই নারীকে সারাজীবন পর্দানশীন রাখতে। এইসব নারীলোভীদের এই প্রশ্নটা করলেই দেখবেন তারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে যে, "তাহলে কি এটাই মেনে নেবো যারা নারীকে পর্দানশিন রাখতে একপ্রকার ফতোয়া জারি করেছে তারা প্রত্যেকেই ছিল নারীভোগী। তাই অন্য পুরুষের কু-নজর থেকে বাঁচতে এমন বিধান লিখেছিলেন?" মজাটা হচ্ছে, সেই ব্যক্তির যুক্তি মানলে এটাই দাঁড়ায় পৃথিবীর সকল পুরষেরাই যেহেতু নারীলোভী তাই নারী নিজেকে সর্বদা পর্দানশিন রাখবে নিজেকে। সত্যি, হাস্যকর (কু)যুক্তি। এমন অদ্ভুত নিয়মকানুনের ফতোয়া যে ধর্ম দেয়, তাকে কি সহিষ্ণু, মানবিক বলা চলে? প্রত্যেক দেশেই রয়েছে নানানরকম ধর্মীয় নিয়মের বাঁধন তাই অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভারতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পারছি যে, দেশে প্রতি দিন ৯১ টি ধর্ষণ ঘটনা ঘটে (সূত্র- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ জানুয়ারি ২০২০, পৃ.৬)। কিছু অতিবোদ্ধারা ধর্ষণের ঘটনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীকে দোষারোপ

করে, বিশেষ করে তার সাজপোশাক কে। কিন্তু এইসব অতিবোদ্ধাদের কেউ এটা অবশ্যই জানিয়ে আসবেন যে, ধর্ষণের ক্ষেত্রে শুধু এবং শুধুমাত্র বিকৃত মানসিকতা, যৌন বিকার ইত্যাদি প্রধান দায়ী, সাজপোশাক নয়। এই মানসিক বিকারগ্রস্তদের কারনেই আসিফা, নির্ভয়া, পুতুল, হাথরস, উন্নাও, বিন্দুদের মতন ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে আকছার। সরকারের অপদার্থতায় এবং রাজনৈতিক পরিচয় ও অর্থের জোরে ধর্ষকদের মতন জঘন্যতম অপরাধীরা আইনকে পকেটে পুরে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। জনগণের দেওয়া করের টাকায় এইসব অপরাধীদের জেলে বসিয়ে চারবেলা খাওয়ানোর কি প্রয়োজন জানা নেই। এদের জন্য একটাই শাস্তি - To be hang till death. (এখানে অনেকেই হয়তো বলতে পারেন ফাঁসি কেন? তাদের বলবো সভ্য দেশে ফাঁসি হয়না। কিন্তু যেখানে প্রতিদিন ৯১ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সেই দেশটাকে সভ্য দেশ কিভাবে বলবো?)

যাইহোক মূল আলোচনা অর্থাৎ হিজাব নিয়ে যে বিতর্ক সেখানে ফেরা যাক। তার আগে একটি বিশেষ খবরের দিকে পাঠক বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। ঘটনাটি মার্চ ২০১৮ সালের। মহারাষ্ট্রর থানে জেলার 'সাঁই হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ'এর একজন শিক্ষার্থীকে হিজাব পরবার অনুমতি দিতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশনা দেয়ার জন্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন।

তার পিটিশনে বলা হয়, তাকে হিজাব পরে তার কলেজে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হোক অথবা অন্য কোনো কলেজে তাকে স্থানান্তর করার অনুমতি দেওয়া হোক যেখানে কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তিনি তার ধর্মীয় বিশ্বাস অনুশীলন করতে পারেন।

এছাড়াও কারো ধর্ম বিশ্বাসের ওপর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করতে না পারে, সেজন্যও জন্য পিটিশনে আদালতের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল।

সেই শিক্ষার্থীর আইনজীবী মিহির দেসাই জানিয়েছিলেন, হিজাব পরে লেকচারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি না দেয়ার কারণে তার মক্কেল ঠিকমত কলেজে উপস্থিত হতে পারেন নি। কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দিন উপস্থিতি না থাকার কারণে তাকে গত বছরের পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। মেডিকেল কলেজের ওই শিক্ষার্থী আদালতকে আরও জানায় যে, তিনি যখন কলেজে ভর্তি হন, তখন তিনি বোরখা ও পরতেন না। ওই সময় এই নিষেধাজ্ঞা কেবল বোরখাতেই ছিল।

বিচারপতি আর এম সাভান্ট ও সারাঙ্গ কোতওয়ালের একটি বেঞ্চে এই রিট আবেদনের শুনানি হয়।

আবেদনকারী তার আবেদনে বলেন, তিনি কেবল হিজাব এবং একটি লম্বা গাউন পরতে চান এবং অন্য ছাত্রীদের মতোই এর উপরে অ্যাপ্রন পরতে ইচ্ছুক। সব পক্ষের বক্তব্য শুনানির পরে আদালত শিক্ষার্থীদেরকে হিজাব এবং গাউন পরার অনুমতি দিতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেন। কলেজ থেকে স্থানান্তরের জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন নেই সেটাও জানিয়ে আদালত পিটিশনটির নিষ্পত্তি করেন।

তাহলে এখন এটা স্পষ্ট, এই হিজাব বিতর্ক আজকের নতুন কিছু নয়। বহুবছর ধরেই বিষয়টি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থেকে গেছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের একশ্রেণীর ব্যক্তিদের দাবী- "এটা আমাদের ইসলামে স্বীকৃত ব্যপার। আমাদের বাড়ির মেয়ে বউরা কি পোশাক পরে বাইরে বেরুবে সেটা নিয়ে যেচে কেউ যেন জ্ঞান না দেয় অথবা অন্যকেউ যেন এতে নিজেদের নাক না গলায়। আমাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত যেন না লাগে এটা সকলের দেখা বিশেষ প্রয়োজন "।

সত্যিই, ধার্মীকরা বড়ই মিষ্টি। "আমার ধর্ম ইসলাম পৃথিবীর সবেচেয়ে সুন্দর, মানবিক, সহিষ্ণু, শান্তি-সম্প্রীতির ধর্ম" ইত্যাদি বলে প্রচার করলেও যখনই তাদের স্বার্থে আঘাত লাগে তখনই নিজদের ভদ্র মুখোশের আড়ালে থাকা কুৎসিত মুখটা বের করে এনে উগ্রধর্মান্ধতার ভয়াবহতা কেমন হতে পারে সেটা প্রকাশ করে ফেলে এরা (বহুর মধ্যে উদাহরণ, বাংলাদেশে একের পর এক মুক্তমনা ব্লগার দের নৃশংশভাবে হত্যাকান্ড)। তখন, শান্তি-সম্প্রীতি, সহিষ্ণু মানবিক ইত্যাদি কথাগুলো কেমন যেন জেলো হয়ে যায়। এই ব্যপারটা পৃথিবীর প্রায় সবকটি প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের (Religion) অনুসারী ধার্মিকদের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য।

আজ এটা দিনের আলোর মতন স্পষ্ট, একটি পুরোনো বিতর্কিত বিষয়কে ইচ্ছেকরেই প্রচারে আনা হচ্ছে এবং একটি রাজনৈতিক দল ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে বিষয়টাকে খুঁচিয়ে বের করে এনে বিতর্কের আগুন পোহাচ্ছে। আরেকটি কথা, যেসকল তরুণেরা গলায় গেরুয়া গামছা পরে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিচ্ছে তাদের উস্কানিও এরাই দিচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে। এইসব তরুণ যুবকরা "ধর্ম" নামক আফিমে এতোটাই আচ্ছন্ন যে, এরা জানেও না কোন মারণ ফাঁদের দিকে এরা নিজেদের পা বাড়াচ্ছে। নিজেদের রাজনীতির স্বার্থেই যারা এদেরকে ব্যবহার করছে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে এইসব যুবকেরাও শেষ। এদের কি মনে হয় সরকার ওদের জন্য উচ্চশিক্ষা এবং তারপরে একটা ভালো স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করবে? তাহলে অনুরোধ, টিভিতে পোগো চ্যানেল এদের জন্য আদর্শ। (তবে "জয় শ্রীরাম" স্লোগানের সেইসব যুবকদের যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার সেইসব হিন্দুবীর যুবমোর্চাকে গৈরিক শুভেচ্ছা জানাই। জনগণের পরিহিত কোনো পোশাক কিংবা যে কোনো চিহ্ন যেটা কোনো ধর্মীয় ইঙ্গিত বহন করে, সেটা অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত। ওমুক যায়গায় তমুক লেখা রয়েছে তাই চলবে কিংবা দীর্ঘবছর ধরে এই নিয়ম চলে আসছে বলেই চলতে দেওয়া হবে এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারনা। সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে জিজ্ঞাস্য, চুরিবিদ্যাটা যুগযুগ ধরে চলে আসছে কিংবা ধর্ষণের মতন চরমতম অপরাধ যুগে যুগে ঘটে চলেছে বলে কি আপনি আজও এসব মেনে নেবেন? তবে আশা রাখবো, কোনো মহিলার হিজাব ব্যান করার আন্দোলনে নামার আগে নিজের কাঁধের গেরুয়া গামছা থেকে শুরু করে নিজের মা,বোন, দিদি, স্ত্রীর শাঁখা, সিঁদুর, ঘোমটা আর ব্রাহ্মণদের পৈতে, টিকি, তিলক অবশ্যই বাতিল করে তারপর যেন মুসলিম মহিলাদের হিজাব বাতিলের জন্য নামবে এই তরুণ শক্তিতে পরিপূর্ণ হিন্দুবীর যুবমোর্চা বাহিনী।)

বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বচ্চ বেকারত্ব কিন্তু একজন মন্ত্রীমশাইয়ের রাজত্বে। "চাকরি দেওয়ার দায় সরকারের নয়।" সংসদে দাঁড়িয়ে সম্প্রতি এমনই বুঝিয়ে দিয়েছেন সেই মন্ত্রীমশাই। এছাড়া উনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, "দেশে বেকারত্বও নেই, মূল্যবৃদ্ধিও নেই।" ২০১৪ সালে যিনি বলেছিলেন, বছরে ২ কোটি চাকরি দেওয়া হবে, সেই মন্ত্রীমশাই এটাও জানিয়ে দিয়েছেন - "কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের উপর ভরসা করে থাকার দিন শেষ হয়েছে। সবকিছু সরকার করে দেবে এই ভাবনা আর চলবে না। আগে মনে করা হতো, সরকারই ভাগ্যবিধাতা, সেই জীবিকার সব দায়িত্ব নেবে। কিন্তু এই ভাবনা ভুল। যুবসমাজ নিজে নিজেকেই গড়বে।"

অন্যদিকে, দিনকয়েক আগে কেন্দ্রীয় বাজেট (Union Budget 2022) পেশ করতে গিয়ে ভারতের মাননীয়া অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন- "আগামী পাঁচ বছরে ৬০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান হবে।" অর্থাৎ প্রতি মিনিটে কি ২.২৮ জনের চাকরি? আরেকটি কথা, এই কেন্দ্রীয় বাজেটে বড়বড় শিল্পপতিদের ট্যাক্স ১৮% থেকে কমিয়ে ১৫% করা হলেও সাধারণ মানুষের ট্যাক্স একটাকাও কমানো হয়নি।

১০ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখে কর্ণাটক হাইকোর্ট অন্তবর্তী রায়ে জানিয়েছিল- " শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন ধর্মীয় পোশাক নয়"। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে গিয়েছে সেইসকল তরুণীরা যারা দাবী জানাচ্ছে "হিজাব আমাদের সাংবিধানিক অধিকার "।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হিজাব পরার কী সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে? ভারতীয় সংবিধানে কিন্তু সরাসরি ভাবে হিজাব পরার কোনো উল্লেখ নেই, আর্টিকেল ২৫ (১)- এ সুস্পষ্ট ভাবে বলা আছে “Freedom of conscience and the right to freely profess, practise, and propagate religion.” সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন সময়ে নিদান দিয়েছেন যে অত্যাবশ্যক ধর্মীয় আচরণ পালনে বাধা দেয়া যাবে না। ভারতীয় সংবিধানের ধারা-২৫ এর প্যারা নং ২ বেশ অন্যরকম। অবশ্য এগুলো যুক্তিবিদ্যার বিষয়। আবেগের নয়। কারন, আবেগ যুক্তির প্রধান শত্রু। অন্যদিকে সংবিধানে ১৫৩এ, ২৯৫,২৯৫এ ইত্যাদি ধারাগুলোও আছে। আসলে ভারতের সংবিধানে এমন অনেক কিছুই রয়েছে যা বিতর্কিত আবার এমনও অনেক কিছু রয়েছে যা যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগাতে বাধ্য।

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে, দেশের নাগরিকদের ছয়টি (৬) মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন - (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, (৫) শাষনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার এবং
(৬) ধর্মীয় অধিকার। এই বিষয়ে সামান্য আলোচনার অবকাশ রয়েছে। সংবিধান আমজনতাকে দিয়েছে ধর্মপালন বা ধর্মাচারণ করার স্বাধীনতা কিন্তু সেটা কখনওই প্রকাশ্যে নয় বরং একান্তে, ব্যাক্তিগত ভাবে।

পৃথিবীতে ৫৬ টি ইসলামিক রাষ্ট্রে হিজাব বা বোরখা পরিধান বাধ্যতামূলক। এরমধ্যে, আফগানিস্তান, ইরান, মৌরিতানিয়া, ব্রুনেই, মালদ্বীপ, সৌদি আরব অন্যতম। শরিয়া আইনে চলা রাষ্ট্রে একজন অমুসলিম মহিলাকেও পাবলিক প্লেসে মাথায় কাপড় দিতেই হয়। নয়তো শরিয়া আইন লংঘনের অভিযোগে শাস্তি দেয়া হয়। বিশেষ করে ইরানে বিষয়টি গর্হিত অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

অপরদিকে পৃথিবীর বেশকিছু ইসলামিক রাষ্ট্রে মুসলিম এবং অমুসলিম দেশে বোরখা বা হিজাব নিষিদ্ধ। যেমন, তাজিকিস্তান, সিরিয়া, তিউনিসিয়া (এই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বা Secular সরকার হিজাবকে Fundamentalism আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ করেছে। তাদের যুক্তি, Hijab is the tool of Political Islam and Oppression Against Women), কসোভো,আজারবাইজান, মিশর (এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিকাব পড়া নিষিদ্ধ। ক্লাস চলাকালীন পুরো মুখ ঢেকে রাখা যাবে না। ২০১৫ সাল থেকে এই আইন বহাল আছে), তুর্কি (মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক পাবলিক প্লেসে যেকোনো ধরনের ধর্মীয় পোশাক পড়া নিষিদ্ধ করেছিলেন। তা প্রায় ৮০ বছর বহাল ছিলো কিন্তু ২০১৩ সালে এরদোয়ান সেই আইনে পরিবর্তন এনেছেন), কাজাখস্তান, কিরঘিস্তান, মালয়েশিয়া, আলজেরিয়াসহ আরো বেশ কিছু মুসলিম দেশে হিজাব বা বোরকার প্রতি বেশ কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া, অমুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া, সুইজারল্যান্ড, গ্যাবন,চাদ, কঙ্গো,নেদারল্যান্ডস, চীন, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশ হিজাব বা বোরখা নিষিদ্ধ করেছে,

আসলে, কিছু দেশ পাবলিক প্লেসে হিজাব পড়লে শাস্তি দেয়। আবার কিছু দেশ পাবলিক প্লেসে হিজাব না পড়লে শাস্তি দেয়। ফলে এটি এখনও অত্যন্ত অদ্ভুত এবং বিতর্কিত।

এই প্রশ্নটা এখন বেশি উঠে আসছে যে, সংবিধান বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে কী হিজাব নিষিদ্ধ হবে? আসলে উত্তরটি জটিল। তবে দেখাযাচ্ছে ভারতে নির্বাচনী হাওয়া এলে এইরকম একটু আধটুক উস্কানি দেখতে হতে পারে। ঠিক যেমন ২০১৯ সালে ভারতে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই পুলওয়ামার নৃশংশ হত্যাকান্ড। এই কান্ডে আমরা দেখলাম অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। একদল উগ্রদেশপ্রেমীরা একপ্রকার মেরে ধরে আমাদের দেশপ্রেম শেখাতে নেমেছিল। যে অথবা যারাই এই হত্যাকান্ড নিয়ে বেশকয়েকটি প্রশ্ন তুলেছিলেন তারাই আক্রান্ত হয়েছিলেন এই স্বঘোষিত দেশপ্রেমী দলের হাতে। ফিরি হিজাব প্রসঙ্গে, ভারতের কেন্দ্রশাসিত সরকার রাজ্য সরকারকে কোনো আইন মানতে বাধ্য করাতে পারে না। তাই একেক রাজ্য একেক পদ্ধতিতে হয় হিজাব বাতিল করবে নয়তো হিজাব পড়ার অনুমতি দিবে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিমকোর্ট।

যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক সংগঠনের দাবী- "শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হোক প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম এবং সমস্তরকম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানবিহীন, সেখানে বিভিন্ন ধর্মগুরুদের জীবনীপাঠও বন্ধ হোক। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে শিক্ষার্জন করুক, বৃদ্ধি পাক তাদের জ্ঞানের উন্মেষ, তারা হয়ে উঠুক মুক্তমনা, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানবতাবাদী"। তাই শিক্ষাপ্রাঙ্গনে হিজাবই হোক কিংবা গেরুয়া গামছা দুটোই পরিধান বন্ধ হোক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় অগ্রাসনের এই রাষ্ট্রীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলুন। শিক্ষাপ্রাঙ্গনে জয় শ্রীরাম কিংবা আল্লাহ্‌ আকবর দুটো স্লোগানেরই বিরোধীতা করুন।
হিজাব /বোরখা আমার চয়েস বলে অনেকেই গলা ফাটাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে ওগুলোর কোনটাই কারোর 'চয়েস' নয়। ওগুলো ধর্ম এবং পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া নিয়মকানুন / রীতিনীতি। আমি, সমস্ত প্রতিষ্ঠানিকধর্ম (Religion) মুক্ত একটা সুন্দর শিক্ষাঙ্গন চাই। সম্পূর্ণ ধর্মমুক্ত। আর ধর্ম! সেটা না হয় থাকুক ব্যক্তিগত পরিসরে।

পরিশেষে বলতে চাই, একটা শিশু, সে যেকোনো ধর্মীয় বিশ্বাসী পরিবারেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সেই শিশুটি জানেই না তার ধর্মবিশ্বাস কি। শিশুটি জানেই না কেন বহুসংখ্যক হিন্দু-মুসলিম দের মধ্যে কেন একটা ঠান্ডা গরম লড়াই চলছে কিংবা ভারত পাকিস্তান কেন ভাগ হলো ইত্যাদি। শিশুটি শুধুই জানে প্রাণখুলে আনন্দ করতে, খেলতে। শিশুর মন একটা মাটির তালের ন্যায়। আমি, আপনি সেই তাল কে যেভাবে গড়তে চাইবো সেভাবেই গড়ে উঠবে। তাই অনুরোধ, ধর্মান্ধ মস্তিষ্কে যুক্তির সন্ত্রাস গড়তে চাইলে, আপনার শিশুটিকে প্রাণখুলে আনন্দ করতে দিন। ওকে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করুন। কোনোরকম ধর্মীয় নিয়মকানুন ইত্যাদি ওর মননে গেঁথে দেবেন না। শিশুটি বড় হলে ওকেই এটা সিদ্ধান্ত নিতে দিন সে, সরকারি কিংবা বে-সরকারি ফর্মের Religion কলামে Hinduism, Islam, Christian, Buddhist, Jainism, Sikhism ইত্যাদি যে ৪২০০ ধরনের Religion রয়েছে তার মধ্যে আদৌ কোনটা বেছে নিতে ইচ্ছুক, নাকি অনেকের মতন জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মীয় পরিচয় ত্যাগ করে Religion কলামে HUMANISM / ATHEISM / NON RELIGIOUS ইত্যাদি কিছু লিখতে চায়। সমস্ত অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ, শৈশবে শিশুদের মননে ছুত অচ্ছুৎ, জাতপাত, ধর্মীয় নিয়মকানুন, বিদ্বেষ ইত্যাদি ঢুকিয়ে উগ্রধর্মান্ধ তৈরী হওয়ার দিকে ঠেলে দেবেন না।

আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, ভারতের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকদের জন্য আশু কর্তব্য হিসেবে বলা হয়েছে, "It shall duty of every citizen of India to develop the scientific temper humanism and the spirit of inquiry and reform {Article 51A(h)Part iv A}" অর্থাৎ, বিজ্ঞানমনস্কতা, মনুষ্যত্ব এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কার সাধনের মানসিকতার বিকাশ ঘটানো।

অতিরিক্ত সংযোজন : আজ ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২। গতকাল ছিল প্রেমের দিন। ভালোবাসার দিনেও হিজাব নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। হিজাব সংক্রান্ত 'এক্সক্লুসিভ খবর' নিয়ে খবরেরকাগজ গুলো লক্ষকোটি প্রিন্ট খরচ করতে যেমন ব্যস্ত, তেমনই অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোও এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই। বহুর মধ্যে মাত্র ৬ টি খবর (বলতে পারেন টপ সিক্স) প্রিয় পাঠক বন্ধুদের জন্য তুলে ধরলাম।

খবর ১) হিজাব ছোঁয়ার চেষ্টা করলে হাত কেটে ফেলব, এসপি নেত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক তুঙ্গে। ১২/০২/২০২২। আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন পোর্টাল।

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটের মধ্যে হিজাব নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন সমাজবাদী পার্টির নেত্রী রুবিনা খানম। অখিলেশের দলের নেত্রীর দাবি, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম অঙ্গ মেয়েদের ঘোমটা এবং হিজাব। কিন্তু তা নিয়ে যে ভাবে রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে, তা ঘৃণ্য। এর পরই এসপি নেত্রীর হুঙ্কার, ‘‘যে হাত হিজাব ছোঁয়ার চেষ্টা করবে, সে হাত কেটে ফেলা হবে।’’

খবর ২) ‘শরিয়ত নয়, সংবিধান অনুযায়ী চলবে ভারত’’, হিজাব বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন যোগী আদিত্যনাথ।
১২/০২/২০২। বাংলা Hunt অনলাইন পোর্টাল।

কর্ণাটকে হিজাব বিতর্কের আলোচনা পুরোদমে। এদিকে, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে হিজাব বিতর্কে বলেছেন যে, দেশ শরিয়ত নয়, সংবিধান দিয়ে চলবে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, দেশের ব্যবস্থা চলবে সংবিধান দিয়ে, শরিয়ত দিয়ে নয়। প্রতিটি সংস্থার নিজস্ব ড্রেস কোড প্রণয়নের অধিকার রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা চলবে।

খবর ৩) হিজাব বিতর্কের আগুন এবার পশ্চিমবঙ্গে, মুর্শিদাবাদে তালাবন্দি শিক্ষকরা। ১২/০২/২০২২। বাংলা Hunt অনলাইন পোর্টাল।

হিজাব বিতর্কের গনগনে আগুনে পুড়ছে গোটা দেশ। এবার সেই উত্তাপের আঁচ এসে লাগল বাংলাতেও। স্কুল ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। আটকে রাখা হল শিক্ষকদেরও। কর্ণাটকের হিজাব বিতর্কের উত্তাপে কার্যতই অগ্নিগর্ভ মুর্শিদাবাদের সুতি।অভিযোগ, ছাত্রীদের স্কুলে কালো ওড়না পরে আসতে নিষেধ করেন সুতির বহুতালি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এই ঘটনা জানাজানি হতেই স্কুলে পৌঁছন পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। কথা বলতে চাওয়া হয় প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে। কিন্তু ততক্ষণে দাবানলের মতন বাড়তে শুরু করেছে উত্তেজনা। এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পরে কয়েক মুহুর্তেই। স্কুল চত্ত্বরে এসে জড়ো হয় স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকদের তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয় একটি ঘরে। চলে অবস্থান এবং বিক্ষোভও। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। শেষ অবধি বহুক্ষণের চেষ্টায় উদ্ধার করা হয় আটক শিক্ষকদের।

খবর ৪) ‘হিজাব পরা মহিলাই একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন’, চ্যালেঞ্জ ওয়েইসির।
১৩/০২/২০২২। সংবাদ প্রতিদিন অনলাইন পোর্টাল।

হিজাব বিতর্কে (Hijab Row) নয়া মাত্রা যোগ করলেন AIMIM প্রধান আসাউদ্দিন ওয়েইসি। তাঁর কথায়, ভবিষ্যতে হিজাব পরিহিতা মহিলাই হবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এহেন মন্তব্য ঘিরেই নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের হিজাব পরা উচিত নাকি অনুচিত, সেই বিতর্কের জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। এর মাঝেই উত্তরপ্রদেশের ভোটপ্রচারে হিজাব বিতর্ক টেনে আনলেন ওয়েইসি (AIMIM chief Asaduddin Owaisi)। এই ইস্যুতে বিজেপিকে তুলোধোনার পাশাপাশি মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়েও মুখ খুললেন তিনি।

খবর ৫) হিজাব না পরার জন্যই ভারতে ধর্ষণ সবচেয়ে বেশি, কংগ্রেস বিধায়কের মন্তব্যে বিতর্কের ঝড়।
১৪/০২/২০২২। সংবাদ প্রতিদিন অনলাইন পোর্টাল।

কর্ণাটকের হিজাব বিতর্কে (Hijab Row) পক্ষে-বিপক্ষে উত্তপ্ত বাক্যবাণ অব্যাহত। গতকাল AIMIM প্রধান আসাউদ্দিন ওয়েইসি (Asaduddin Owaisi) বলেন, হিজাব পরা মহিলাই একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। আজ কর্নাটকের কংগ্রেস (Congress) বিধায়ক জমির আহমেদ (Zameer Ahmed) বিতর্ক আরও বাড়ালেন। বললেন, মহিলারা হিজাব পরেন না বলেই ভারতে ধর্ষণের হার সবচেয়ে বেশি। কংগ্রেসের বিধায়কের মন্তব্যে নিন্দার ঝড় উঠেছে নেট দুনিয়ায়।
রবিবার সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জমির আহমেদ বলেন,” ইসলাম ধর্মে হিজাব হল এক ধরনের পর্দা। একটা বয়সের পর মেয়েদের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে হিজাব ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আজ ভারতে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। এর কারণ কী? এই জন্যই যেহেতু অনেক মহিলাই হিজাব পরেন না।” জমির আরও বলেন, হিজাব কখনই বাধ্যতামূলক নয়, তবে যাঁরা নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে চান, নিজের সৌন্দর্যকে সকলের সামনে প্রকাশ করতে চান না, তাঁরাই হিজাব পরেন। জমির দাবি করেন, “হিজাব পরার ব্যাপারটা নতুন না, বহুকাল ধরে এই রীতি প্রচলিত।”
খবর ৬) মেয়েটোর নাম আরুশা পারভেজ (Aroosa Parvaiz) সমগ্র কাশ্মীরে ক্লাস ১২ এ প্রথম স্থানাধিকারী। সে ৪৯৯ নং পেয়েছে ৫০০ এর মধ্যে।কিন্তু তাঁর এই বিশাল সাফল্য তাঁকে অপমান, কটুক্তি, হুমকি থেকে বাঁচাতে পারেনি। কারন, কট্টরপন্থীরা একপ্রকার মেয়েটির হত্যার ফতোয়া জারি করেছে। কারন, মেয়েটোর মাথায় হিজাব নেই। এটাই তার মস্তবড় অপরাধ।
অবশ্য এই প্রতিভাবান মেয়েটি ভয়ে আতঙ্কে সিঁটিয়ে থাকেনি। কট্টরপন্থীদের যোগ্য জবাব সে দিয়েছে। আরুশার জানিয়েছে -"I don't need to wear hijab to prove a good muslim.These comments do not matter to me, but my parents are undergoing a trauma.My religion, my hijab and my Allah are my personal issues. What I should wear or not should not bother people if they believe in the greatness of my religion." অর্থাৎ, আরুশা জানিয়েছে, সে হিজাব পরবে কি পরবে না সেটা একান্তই তার ব্যাক্তিগত ব্যাপার। তাকে কেউ বাধ্য করতে পারে না।

সংবিধান, ধর্মীয় অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে

-ঈশান দে

ভারতবর্ষের সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি থেকে চালু হয়। বাবাসাহেব ডঃ বি.আর.আম্বেদকর সংবিধান কিন্তু একা লেখেননি। সর্বপ্রথমে উনি বেশ কয়েকটি দেশবিদেশের সংবিধান গ্রন্থ ও আইনি বইপত্র ভালো করে পড়ে তারপরে সেখান থেকে নির্যাস নিয়ে, দীর্ঘ আলোচনার পরে ২৯৯ জনের মিলিত মতামতে জন্ম সংবিধানের।

সময়ের সাথে যেমন বিভিন্ন বইপত্র সংশোধন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের প্রয়োজন হয় তেমনই ভারতীয় সংবিধানও হয়েছে। ১১ আগষ্ট ২০২১ এ পার্লামেন্ট পাশ হয়েছে ১২৭ তম সংবিধান সংশোধনী বিল। এতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ মহাশয় স্বাক্ষর করায় সেটি পরিণত হয়েছে ১০৫ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে। প্রসঙ্গত জানাই, এই সংশোধনীর ফলে রাজ্যগুলি নিজেরাই নিজস্ব ওবিসি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তার জন্য ন্যাশনাল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের অনুমতি লাগবে না। এর জন্য ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২-এ এবং ৩৪২ এ (৩) ধারা সংশোধন করা হয়েছে।

সংবিধানের শুরুতে সেখানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বা 'Secular' শব্দটি ছিল না। মাননীয়া ইন্দিরা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৭৬ সালে ১১ নভেম্বর ভারতের পার্লামেন্ট অনুমোদিত এবং ১৮ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত রাষ্ট্রপতির ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে 'সমাজতান্ত্রিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' (কোনোরকম সংজ্ঞা ছাড়াই) শব্দদুটি যুক্ত করা হয়। মুখবন্ধের (Preamble) প্রথম অনুচ্ছেদে 'ধর্মনিরপেক্ষ' (Secular) শব্দটি ব্যবহার করার পরে যেখানে লেখা হয়েছে -" We The People Of India, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC, REPUBLIC and to secure to all its citizens;"(অর্থাৎ, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হল সংবিধানের মৌলিক নীতি)।

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে, দেশের নাগরিকদের ছয়টি (৬) মৌলিক অধিকার দেওয়া দিয়েছে (সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)। যেমন - (১) সাম্যের অধিকার (২) স্বাধীনতার অধিকার (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মীয় অধিকার, (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, এবং (৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

ধর্মনিরপেক্ষতা' বা 'Secularism' শব্দটা নিয়ে আমজনতার মধ্যেই রয়েছে প্রচুর বিভ্রান্তি, সঙ্গে তথ্যবিকৃতিও করা হয়েছে বিশেষ উদ্দ্যেশ্যে। ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির উৎপত্তি ইউরোপে। 'Secularism' এর আভিধানিক অর্থ - "An ism does not related with religion and non entity to any supernatural existence"। অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে কোনও রূপ সম্পর্কিত নয় এমন একটি মতবাদ হল ধর্মনিরপেক্ষতা। নিরপেক্ষ শব্দের অর্থ কোনও অথবা কারোর পক্ষেই নয় থাকা নয়। তাই ধর্মনিরপেক্ষ মানে মোটেই সর্বধর্মসমন্বয় নয়, এর অর্থ 'রাষ্ট্র' ('রাষ্ট্র' অর্থে এখানে একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে বোঝানো হয়েছে। যেমন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, সাংসদ বিধায়ক, সরকারি আমলা থেকে পাড়ার কাউন্সিলর ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে) কোনও ধর্মের পক্ষেই থাকবে না, সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রেই থাকবে নিরপেক্ষ বা সম্পর্ক বর্জিত। ঠিক যেমনটা একজন রেফারী ইষ্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের মধ্যে ফুটবল খেলায় অথবা ভারত বনাম পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় আম্পেয়ার নিরপেক্ষ থেকে খেলা পরিচালনা করেন।

নির্বাচনে দাঁড়ানো ডান-বাম-ওপর-নীচ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো উক্ত প্রস্তাবনাকে সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকারে "The Representation of the People Act 1951" (Amendment 1989) এর 29(A) ধারায় দায়বদ্ধ। অবশ্য, কার্যক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের "ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়" এর অবস্থা হতে পারে। এমনকি নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে অনেক। আইনের প্রয়োগ এবং সদিচ্ছার অভাবে ভারতে গোদীলোভী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থেই ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার করে, তথ্য বিকৃতি ঘটিয়েছে অনেক আগেই।

এইখানে একটি বিশেষ খবর জানিয়ে রাখা উচিত হবে যে, গত ৩ রা জানুয়ারি ২০১৭ তে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় ও ভাষার ভিত্তিতে ভোট চাওয়া বা ভোট না দিতে প্ররোচিত করাকে দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ বলেই রায় দিয়েছিল ভারতের সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির বেঞ্চে চার জন বিচারপতি এ ব্যাপারে জানিয়েছেন, কেবল প্রার্থী নয়, ভোটারদের ধর্ম-বর্ণের ধুয়ো তুলেও ভোটের প্রচার করা যাবে না। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৩(৩) ধারায় ধর্ম, জাতি, ভাষা, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভোট চাওয়া অবশ্য এমনিতেই নিষিদ্ধ। শীর্ষ আদালত বলেছে— কেবল প্রার্থী নয়, প্রচারে আনা যাবে না ভোটারদের ধর্ম, জাতি, ভাষার কথাও। এমনকী প্রার্থীর এজেন্টের সামাজিক পরিচয়ের জোরেও ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা যাবে না। এখন প্রশ্ন এটাই, শীর্ষ আদালতের এই রায় কার্যকর করা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে সন্দিহান অনেক রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, ধর্ম- জাতপাতের ভিত্তিতে ভোট চাইলে প্রার্থী পদ বাতিল করার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। তারা বড়জোর আদালতে যেতে পারে। এই বিষয়টি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে হলে আইন করে কমিশনকে আরও ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু তা করতে ভয় পায় সব দলই। কারণ ধর্ম, জাতপাতের অঙ্ককে অস্বীকার করার ক্ষমতা তাদের নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে ধর্মীয় মেরুকরণ এবং অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্রর ঝাঁঝালো বক্তব্য রেখেই কিন্ত ২০১৩ সালে একটি রাজনৈতিক দল ভারতে কেন্দ্র সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল।

ভারতীয় সংবিধানে ২৫ থেকে ২৮ নং ধারায় আমজনতার ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি রয়েছে, যা আবেগের নয় বরং যুক্তিপূর্ণ আলোচনার বিষয়। ভারতীয় সংবিধান আমজনতাকে দিয়েছে ধর্মপালন বা ধর্মাচারণ করার স্বাধীনতা, কিন্তু সেটা কখনওই প্রকাশ্যে নয় বরং একান্তে, ব্যাক্তিগত ভাবে। অন্যদিকে, ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের কথাও সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। যেমন, প্রতি ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানমনস্কতা, মনুষ্যত্ব এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কার সাধনের মানসিকতার বিকাশ ঘটানো। "It shall duty of every citizen of India to develop the scientific temper humanism and the spirit of inquiry and reform.{Article 51A(h)Part iv A}"।

ধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় অধিকার বা ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আমজনতার মধ্যে রয়ে গেছে নানানরকম বিভ্রান্তি। অন্যদিকে বিজ্ঞান আন্দোলন কর্মীদের উচিৎ খুব ঠান্ডা মাথায় ভারতীয় সংবিধান এবং ভারতীয় আইনের বইপত্র ভালো করে পড়ে দেখা। আমাদের সংবিধানে এমন বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো পরস্পরবিরোধী যার সংশোধনের প্রয়োজন আবশ্যক। আবার এমনও কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগাতে বাধ্য।

যেমন -১) সংবিধানে বর্ণিত একটি Secular, Democratic, Republic Country ভারতে লাগু রয়েছে শরীয়া আইন (The Muslim Personal Law (Sharia) Application Act,1937)। ভারতে এটি শুধু মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মূলতঃ বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক, অভিভাবকত্ত্ব এর মত বিষয়গুলি শরিয়া আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে এখানে শরীয়া আইন কার্যকরী নয়। মূলতঃ এই আইন দ্বারা ভারতীয় মুসলিম মহিলারা নিষ্পেষিত ও শোষিত।

২) ব্লাসফেমি অ্যাক্ট। কোনও বিশেষ ধর্মের বিষয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করাকে 'ব্লাসফেমি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের 'Commission on International Religious Freedom' এর ২০১৭ সালের রিপোর্টে ৭১ টি দেশের তালিকা উঠে আসে যেখানে ব্লাসফেমি আইন রয়েছে। এই আইনের অধীনে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

বহু কিছুর মধ্যে একটা মর্মান্তিক শোনা যাক। সম্ভবত আগষ্ট ২০২১ এর ঘটনা, ধর্ম অবমাননার দায়ে পাকিস্তানে আটক একটি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী পরিবারের ৮ বছরের ছেলে মৃত্যদন্ডে দণ্ডিত। যে বয়সের শিশুরা জানেই না ধর্ম নামক জিনিসটা খায়, নাকি মাথায় মাখে? সেই বয়সের একটি শিশু কীভাবে ধর্ম অবমাননা করতে পারে? সে কীভাবেই বা অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করতে পারে?

দন্ডবিধি ১৮৬০, অনুচ্ছেদ ১৫র ২৯৫ ধারা থেকে ২৯৮ ধারা (IPC-295-298) পর্যন্ত সংশোধন করা প্রয়োজন এবং এর মধ্যে ২৯৫-ক (IPC-295A) ধারাটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা খুবই প্রয়োজন। সংবিধান প্রতিশ্রুত নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী এই আইন। আলোচনা, সমালোচনা, মতপ্রকাশ এবং উস্কানি, বিদ্বেষ, ঘৃণাবাদ এক নয় অন্যদিকে, দন্ডবিধি-১৮৬০ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২৯৫-ক ধারাটিতে আলোচনা, সমালোচনা, বাক্ স্বাধীনতা তথা মতপ্রকাশের অধিকার হরণ করা হয়েছে।

৩) ভারতীয় সংবিধানের ২৮ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.' অর্থাৎ, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনওরকম ধর্মীয় নির্দেশ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা যাবে না। আবার, ২৮ (২) নং ধারায় লেখা হয়েছে- 'Nothing in clause 28(1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.' ফলে কনভেন্ট স্কুল বা মিশনারি স্কুল কিংবা বৈদিক বিদ্যালয় অথবা মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। এই স্ববিরোধীতা সংশোধনের বিশেষ প্রয়োজন।

“আমাদের অঞ্চলে সৌন্দর্য অশ্লীল, অসৌন্দর্য শ্লীল। রুপসীর একটু নগ্ন বাহু দেখে ওরা হৈ চৈ করে, কিন্তু পথে পথে ভিখিরিনির উলঙ্গ দেহ দেখে ওরা একটুও বিচলিত হয় না”

–হুমায়ুন আজাদ

একবিংশ শতকের নতুন আতঙ্ক সিএএ

- পৃথ্বীশ ঘোষ

ছোটবেলায় যখন লেখা পড়া শুরু করেছিলাম তখন বই খুললেই প্রথমে সংবিধান এর প্রস্তাবনা দেখে দেখে মুখস্ত হয়ে গেছিল। তাতে সমানাধিকার এর কথা থাকত। বর্তমান শাসক শ্রেণী ধর্মীয় মেরুকরণ ও জাতপাত নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে এই সমানাধিকার এর ব্যাপারটাই গুলিয়ে দিতে চাইছে। যে রাষ্ট্রে সাক্ষরতার হার খুব সন্তোষজনক নয় তাদের কত শতাংশ মানুষ যে এটা বুঝবে সন্দেহ। আমাদের দেশে বিল (সি এ বি, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল) টি খুব কম লোকেই পড়েছে বেশিরভাগ লোকেই কিন্তু শাসক বিরোধী বক্তব্য শুনে বিভ্রান্ত এমন অবস্থায় 2019 সালের 11 ডিসেম্বর গভীর রাতে পাস হয়ে গেল। বিলের উদ্দেশ্য 1955 সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন। আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী অবৈধ অভিবাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। মুসলিমদের জন্য এখানে কোন সুযোগ রাখা হয়নি। শাসকশ্রেণী বোঝাল এতে হিন্দুদের কোন অসুবিধা নেই খালি ঘুসপেটিয়া দের তাড়িয়ে দেওয়া হবে, ওহ কি মজা। বিধি বাম। 31 আগস্ট 2019 আসাম এনার্সির তালিকা থেকে দেখলাম 19 লক্ষ মানুষের নাম বাদ। পাঠক এতটুকু শুনেই অবাক হচ্ছেন আর একটা তথ্য পেশ করি তার মধ্যে 12 লক্ষ হিন্দু বাঙালির। আপনি ভাবলেন বিজেপি তো হিন্দু দের কিছু করবে না বেছে বেছে মুসলিম দের তাড়াবে, আজ্ঞে না এরকম কোন দিবাস্বপ্ন দেখলে এখুনি বেরিয়ে আসুন। বাংলার এক গো নেতা সেদিন বললেন এনার্সি হলে নাকি 2 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। এই আনন্দে রাম্ভক্ত হনু ভক্ত গো সন্তান রা যদি আনন্দে আমোদে ফেটে পড়ে কিছুদিন বাদে এনার্সি লাগু হলে তাদের কয়েকজন এর নাম বাদ যায় তাহলে কারা বাঁচাবে?? যেমন টা আসামে বিজেপি নেত্রী ববিতা পাল এর নাম বাদ গেছে। ইনি কিন্তু এনার্সি র পক্ষে জোরদার প্রচার চালিয়েছেন।

সিটিজেন আমেন্ডমেন্ট আইন চালু হলে কতজন বাঙালি নাগরিকত্ব পাবে ? মাত্র 31 হাজার 313 জন। এর ভেতরে আপনার নাম থাকবে তো? কিছুদিন আগেই টাকলুভাই বললেন যে আধার ভোটার নাকি নাগরিকত্বের পরিচয় নয়। মানছি আধার শুধু পরিচয় কখনোই নাগরিকত্ব নয়। তাই বলে ভোটার কার্ড? উনি আরো বলেন অত্যাচারিত হয়ে যে এসেছে সে হিন্দু হলে তার হিন্দুত্বের প্রমান। এরা কখন কি বলে মানুষ কে বিভ্রান্ত করে দেবে আপনি সেই বিভ্রান্তির মধ্যেই নিজ দেশে নিজেই বিদেশি হয়ে যাবেন ধরতে পারবেন না। খুব সুচতুর গেম প্ল্যান কষে এগোচ্ছে আরএসএস এন্ড কোং। মানুষের বেসিক চাওয়া শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান চাকরি এগুলো থেকে নজর ঘুরিয়ে দিতেই পাকিস্তানএর সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা, 370 ধারা, নাগরিকত্ব, দেশীয় সংস্থা বিক্রি আর বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিস্কার যেমন গরু র দুধে সোনা, মহাভারত এ ইন্টারনেট, হাস জলে অক্সিজেন ছাড়ে এরকম কত কি। যে নাগরিকদের বৈধ ভোট দিয়ে গেরুয়া বাহিনী কে ক্ষমতায় আনল আজ তারাই দাবী করছে আপনি নাগরিক নন। বাহ চমৎকার এই তো গোলওয়ালকর, সাভারকার দের শিক্ষা। দিল্লির নির্বাচনী ফলাফল পরিষ্কার মানুষ জাত পাত, ধর্মের রাজনীতি পছন্দ করছে না। হেঁয়ালি ছেড়ে পরিষ্কার কথায় আসি ধরুন আপনার পরিবারের 4 জনের নাম বাদ গেছে এবার নিয়ম মতো আপনাকে কাগজপত্র নিয়ে 120 দিনের মধ্যে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল এ আপীল করতে হবে নিজেদের ভারতীয় প্রমান করার জন্য।সেখানকার রায় আপনার বিপক্ষে গেলে হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিমকোর্ট। হাইকোর্ট এ আবেদন করতেই লাগবে 19 থেকে 20 হাজার টাকা জনপ্রতি। সুপ্রিমকোর্ট ছেড়েই দিলাম এবার বলুন তো দিন আনা দিন খাওয়া সংসারে 4 জনের যদি এরকম অবস্থা হয় আপনার মৃত্যু ছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা থাকবে কি? রাতের ঘুম উড়িয়ে আপনাকে পুরে দেবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। সেখানে আপনারা কেউ একসঙ্গে থাকতে পারবেন কিনা সন্দেহ। যারা আসামের হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেয় নি তারা কি করে বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেবে? বিজেপির বাবার ও ক্ষমতা নেই দেবার আইনের নিয়ম অনুযায়ী। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় যে শরণার্থী ও নাগরিকত্ব এক জিনিস নয়। একজন নাগরিক সে যে যে সুবিধা পাবে একজন শরনার্থী সেগুলো পাবেনা। ভোটদান এর সুযোগ, শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান এগুলোর কোন দাবী একজন শরনার্থী করতে পারে না। রাষ্ট্রের দয়া ভিক্ষা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন এত মানুষ যে নাগরিকত্ব হারালো এরা যাবে কোথায়??? উত্তর খুব সহজ ডি ক্যাম্প। খুব সস্তা শ্রম এখন সারা বিশ্ব জুড়েই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে পুঁজিবাদের কল্যানে। নাম মাত্র বা বিনামূল্যে হাড়ভাঙা খাটিয়ে নাম মাত্র খেতে

চিকিৎসা দিয়ে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। যে ক্যাম্প গুলো জার্মানি তে হিটলার শুরু করে গেছিলেন সেই একই কায়দায় নাম পাল্টে ডিটেনশন ক্যাম্প হয়ে ফিরে এসেছে। এখনো সময় আছে গর্জে না উঠলে সর্বনাশ। একনজরে দেখে নি আসাম এর বাদ পড়া জনজাতি গুলির পরিসংখ্যান-

বাঙালী হিন্দু 6.90 লাখ

পুর্ব বাংলা বংশোদ্ভূত মুসলিম 4.86 লাখ

গোর্খা 85,000

অসমীয়া হিন্দু 60,000

কোচ রাজবংশী 58,000

গরিয়া মরিয়া দেশি 35,000

বোরো 20,000

করবি 9,000

রাভা 8,000

হাজং 8,000

মিসিং 7,000

অহম 3,000

গারো 2,500

মাতাক 1,500

ডিমাসা 1,100

সোনোয়াল কাছারি 1,000

মারান 900

বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী 200

নাগা 125

হামার 75

কুকি 85

থাডো 50

বাইট 85

ভারতের নাগরিক তারাই যারা 1971 এর আগের দলিল ও ঠাকুর্দার ভোটার লিস্টে নাম দেখাতে পারবে। মোট দশটা প্রমাণপত্র। 76 এর বন্যায় অনেক মানুষের অনেক কাগজপত্রই নষ্ট হয়ে গেছে তারা পারবেন তো কাগজ দেখাতে? ওপার বাংলায় মুসলিম দের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন সেই FIR কপিও দেখাতে হবে। যারা এসে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছিলেন সেই সংখ্যা কত? 31 হাজার 313 জন। আর সারা ভারত জুড়ে কতজন বিদেশি নাগরিকত্ব পাবেন 31 হাজার সেই 313 জন। কি মজা না।

NRC আতঙ্ক গ্রাম-শহরে ছড়িয়ে পড়ছে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও নিউজ পোর্টালে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী চিত্রটা ভয়াবহ:

এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে NRC শহীদ ২২জন!

তথ্যসূত্র- 1- উইকিপিডিয়া (এন আর সি)

2- বিভিন্ন সময়ের এই সময় পত্রিকা।

3- আ বা প - 1/9/19

4-https://www.sabrangindia.in/article/over-7-lakh-hindus-among-those-excluded-nrc-leaked-data-suggests

প্রার্থনালয়

– হুমায়ুন আজাদ

ছেলেবেলায় আমি যেখানে খেলতাম
তিরিশ বছর পর গিয়ে দেখি সেখানে একটি
মসজিদ উঠেছে।
আমি জানতে চাই ছেলেরা এখন খেলে
কোথায়?
তারা বলে ছেলেরা এখন খেলে না, মসজিদে
পাঁচবেলা নামাজ পড়ে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বুড়িগঙ্গার ধারে
বেড়াতে গিয়ে
যেখানে একঘন্টা পরস্পরের দিকে নিষ্পলক
তাকিয়ে ছিলাম আমি আর মরিয়ম,
গিয়ে দেখি সৌদি সাহায্যে সেখানে একটা লাল
ইটের মসজিদ উঠেছে।
কোথাও নিষ্পলক দৃষ্টি নেই চারদিকে
জোব্বা আর আলখাল্লা।
পঁচিশ বছর আগে বোম্বাই সমুদ্রপারে এক
সেমিনারে গিয়ে
যেখানে আমরা সারারাত নেচে ছিলাম আর পান
করেছিলাম আর নেচে ছিলাম,
১৯৯৫-এ গিয়ে দেখি সেখানে এক মস্ত মন্দির
উঠেছে।
দিকে দিকে নগ্ন সন্ন্যাসী, রাম আর সীতা,
সংখ্যাহীন হনুমান;
নাচ আর পান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
ফার্থ অফ ফোর্থের তীরের বনভূমিতে
যেখানে সুজ্যান আমাকে
জড়িয়ে ধ'রে বাড়িয়ে দিয়েছিলো লাল ঠোঁট,
সেখানে গিয়ে দেখি মাথা তুলেছে এক গগনভেদি
গির্জা।
বনভূমি ঢেকে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত
ঝুলছে এ ক্রুদ্ধ ক্রুশকাঠ।
আমি জিজ্ঞেস করি কেনো দিকে দিকে এতো
প্রার্থনালয়?
কেনো খেলার মাঠ নেই গ্রামে?
কেনো নদীর ধারে নিষ্পলক পরস্পরের দিকে
তাকিয়ে থাকার স্থান নেই?

কেনো জায়গা নেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে
চুম্বনের?
কেনো জায়গা নেই নাচ আর পানের?
তারা বলে পৃথিবী ভ'রে গেছে পাপে,
আসমান থেকে জমিন ছেয়ে গেছে গুনাহ্'য়
তাই আমাদের একমাত্র কাজ এখন শুধুই
প্রার্থনা।
চারদিকে তাকিয়ে আমি অজস্র শক্তিশালী
মুখমণ্ডল দেখতে পাই,
তখন আর এ কথা অস্বীকার করতে পারিনা।

রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র(?)

-জামাল আনসারী

করোনা অজুহাত আর তুমি দিও না।
শিক্ষাকে এভাবে আর ধ্বংস করো না।

মাথাটা ঠান্ডা রেখে একটু ভেবে দেখো—
চোখ- কান খুলে তুমি একটু হলেও শেখো।

লেখা পড়া ছেড়ে শিক্ষার্থী করোনাতঙ্কে মরে!
করোনা-ভাইরাস কি শুধুই স্কুলে বাস করে?

চলছে মিটিং, চলছে মিছিল, করোনা তো নাই
চলছে বাস, চলছে ট্রেন, ভাইরাসের ভয় নাই—

হাটে- বাজারে ভিড়, খোলা আছে শপিংমল!
শুধু স্কুলে প্রবেশ নিষেধ! চলছে সিনেমা হল।

সব তো স্বাভাবিকই আছে। শুধু স্কুলটা ছাড়া,
তবুও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খোলার নেই কো তাড়া!

ভোটের পর ভোট আসছে, ঢেউ এর পর ঢেউ
কত যে ঢেউ আছে! বোঝেই না মানুষ কেউ।

করোনা ভাইরাস, তবে কি রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র (?)
করোনা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ব্যবসার মূলমন্ত্র!

ঢেউ উঠলেই কেন বন্ধ হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান?
যুব সমাজকে মূর্খ বানানো সরকারেরই ধ্যান।

শিক্ষা-ছাড়া ছেলেমেয়ের ভবিষ্যত অন্ধকার
শিক্ষার্থীর স্বার্থে স্কুল-কলেজ খোলা দরকার।

ছিল ব্রিটিশ যেমন

-রবীন্দ্র নারায়ণ তালুকদার

কতো বড়ো পাল্টি বাজ
একটু ভাবুন বসে
কতো বড়ো কালো হাত
হিসেব করুন দেখে!
মায়ের গয়না চুরি করেছে
১৮ বছর বয়সে
নিজের দাদাই বলে দিয়েছে
প্রচারসভায় এসে!
৩৫ বছর অবধি ভিখারী ছিল
নিজের মুখের কথা
কখন আবার পড়াশোনা করল
বসুক বিচারের সভা!
স্টেশন ছাড়া চায়ের দোকান
কলেজে লাগিয়েই পড়া
ডিজিটাল পিন্ট মেশিনের আগে
হয়েছে মানপত্র গড়া!
বহুরূপী সেজে বলেছিল
২ কোটি চাকরি দেবে
কেমন সুন্দর ঘুরে দাড়াল
চাকরি গেল জলে!
বাড়লো বেকারত্ব-ক্ষুধার্ত
কমল শিক্ষিতের হার
জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া
দেখ গরীবের দিনকাল!
কর্পোরেট কতো আয় বাড়ালো
আবার তাদেরই টাক্সে ছাড়
গরীবের কোনও সুবিধা নেই
শুধু ভিক্ষে নিয়ে খাও!
গরীবকে গরীব একেজো করছে
নানান কুপথের সড়যন্ত্রে
ভোটে ২০লক্ষ্য ইভিএম হারিয়ে
কতো সুন্দর মসনদে!
বিচার শুধু নামেই আছে
বিচারকের দায়িত্ব কম
সুন্দর ইশারায় দেশ চলছে
ছিল ব্রিটিশ যেমন!!

কফিনবন্দী

-প্রদীপ চক্রবর্তী

হিজাব পরবো ? নাকি গেরুয়া পরবো ? ------------
শপথ নাও হাতে হাত রেখে, শুধু বই পড়বো।
ধর্ম নিয়ে অনেক তো হল, এবার জীবনের কথা বলো,
যুক্তির ইন্ধন নিয়ে মনুষ্যত্বের পথে চলো।

জাতপাতের নির্লজ্জ ধ্বজা এবার নামিয়ে নাও,
ভয়কে জলাঞ্জলি দিয়ে; সামনে এগিয়ে যাও।
ভাগ্যিস ভাগ্যটা নেই; জ্যোতিষের দাবি মতো,
পাথরের আংটি রোগ সারালে; কী কাণ্ডটাই না হতো।

করোনা সারাতে কোন্ পাথর?
জ্যোতিষের দাবি মতো,
কফিনবন্দী করে ফেল তাই
অন্ধ কুসংস্কার যত।

বিশেষ সংবাদ-

১। যে কোনও ভারতীয়র অধিকার রয়েছে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার', রায় মাদ্রাজ হাইকোর্টের

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: সমাজ সংস্কারক পেরিয়ার ই ভি রামস্বামীর অনুগত এবং দ্রাবিদার কাজহাগাম-এর সদস্যদের সম্পূর্ণ মৌলিক অধিকার রয়েছে ঈশ্বর এবং ধর্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার। ঠিক যেমন অন্যদের অধিকার আছে ঈশ্বর বিশ্বাসে। এই রায় ঘোষণা করল মাদ্রাজ হাই কোর্ট।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দানের সময়ে বলে, 'মামলাকারীর যদি অধিকার থাকে ভারতীয় সংবিধানের ১৯ ধারা অনুযায়ী ঈশ্বারের অস্তিত্ব এবং ধর্ম সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশের, তাহলে সুপ্রিম কোর্টেক লালাই সিং যাদব মামলার উদাহরণ তুলে আমরাও বলছি পেরিয়ার ই ভি রামস্বামীর অনুগত এবং দ্রাবিদার কাজহাগাম-এর সদস্যদেরও ভারতীয় সংবিধান সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছে ঈশ্বরকে অস্বীকার করার। 'ডিভিশন বেঞ্চে এদিন উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি এস মণিকুমার এবং সুব্রামোনিয়াম প্রসাদ।

১৯৬৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সমাজ সংস্কারক পেরিয়ার ই ভি রামস্বামী জীবিত থাকাকালীন ত্রিচিতে উন্মোচিত হয় তাঁর একটি মূর্তি। উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সি এন আন্নাদুরাই। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে কামরাজও। তাঁর সেই মূর্তির নিচে লেখা হয়েছিল, 'ঈশ্বর বলে কেউ নেই... ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্বই নেই। যে ঈশ্বরের জন্ম দিয়েছে সে ভীষণই বোকা। যে ঈশ্বরের প্রচার করেছে সে স্কাউনড্রেল এবং যে ঈশ্বরের আরাধনা করে সে বর্বর, আদিম।'
মামলাকারী এম দেইভানয়াগমের দাবি ছিল, এই ধরনের আক্রমণাত্বক এবং আপত্তিকর মন্তব্য পেরিয়ার কোনওদিনও করেননি এবং তাঁর মৃত্যুর পর এই সব কথা লেখা হয়েছিল মূর্তির নিচে। দ্রাবিদার কাজহাগাম-এর সভাপতি এর বিরোধিতা করে বলেন, 'থানথাই পেরিয়ার আগে থেকেই বুঝেছিলেন, তাঁর মূর্তির নিচে এই কথাগুলি লেখা না হলে কিছু বছর পর তাঁকেই ঈশ্বর জ্ঞানে মানুষ পুজো করা শুরু করবে। সেই জন্যেই এই কথাগুলি তিনি বলে গিয়েছিলেন।'
সূত্র-
https://eisamay.indiatimes.com/nation/madras-high-court-declares-that-indian-constitution-has-given-right-to-its-citizens-to-deny-gods-existence/articleshow/71006042.cms

২। কলেজে ভর্তির ফর্মে সবার উপরে মানবধর্ম

ধর্মের নাম মানবতা। পড়ুয়াদের ভর্তির ফর্মে এ বার চাইলে এমনটাও লিখতে পারেন কোনও আবেদনকারী। এ বছর ভর্তির জন্য অনলাইনে ফর্মে পড়ুয়াদের জন্য এই সুযোগ করে দিচ্ছে কলকাতার বেথুন কলেজ এবং মেদিনীপুর কলেজ।

গত সোমবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে সেই রাত থেকেই অনলাইনে বিভিন্ন কলেজের ফর্ম পূরণ শুরু হয়েছে। আর সেখানেই বেথুন ও মেদিনীপুর কলেজের জন্য ফর্ম ভর্তি করতে গিয়ে আবেদনকারী ছাত্রীরা দেখতে পাচ্ছেন, ধর্মের কলামে তালিকার প্রথমেই রয়েছে মানবধর্ম। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্ট বা অন্য যে কোনও ধর্মকে বাদ দিয়ে মানবতাকে নিজের ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার সুযোগ পাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা।

কেন এই উদ্যোগ? বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা মমতা রায় জানাচ্ছেন, গত বছরও কলেজে ভর্তির অনলাইন ফর্ম থাকলেও তাতে মানবতাকে নিজের ধর্ম বলে বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল না। তিনি বলেন, "অনেক আবেদনকারী হয়তো কোনও ধর্মেই বিশ্বাস

করেন না। তিনি হয়তো শুধু মানবধর্মে বিশ্বাসী। এই আবেদনকারীরা ওই কলামে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান-সহ নানা ধর্মের মধ্যে ‘অন্যান্য’ বলে যেখানে উল্লেখ থাকত তা বেছে নিতেন। অনেকে আবার লিখে দিতেন ‘নন বিলিভার’। এ বার থেকে তাঁরা নিজের মত আরও স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারবেন।” অধ্যক্ষার মতে, মানবতা ছাড়া যে কোনও ধর্মই হয় না, সেই বার্তাও এর মাধ্যমে নবীন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে। আর মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র বেরা বলছেন, “মানুষের প্রথম পরিচয় সে মানুষ। মানবতাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাই কলামটি এমন রাখা হয়েছে।”

বেথুনের অধ্যক্ষা অবশ্য জানাচ্ছেন, সুষ্ঠু ভাবে ভর্তির মেধা-তালিকা বার করাটাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। তবে তার মধ্যেই ছোট ছোট বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই এ বার অনলাইনে ভর্তির আবেদনপত্র প্রকাশের আগে কলেজে অ্যাডমিশন কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এ বারের আবেদনপত্রে ধর্মের তালিকায় স্থান পাবে মানবধর্ম।

বেথুন ও মেদিনীপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন আবেদনকারী ছাত্রী থেকে শুরু করে তাঁদের অভিভাবকদের অনেকেই। তাঁদের একাংশের মতে, এর ফলে অনেকেই নিজের মত প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছেন।

তবে শুধু কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেই নয়। চাকরির আবেদন থেকে শুরু করে নানা জায়গায় ফর্ম ভর্তি করার সময়ে ধর্মের নাম লেখার একটি জায়গা থাকে, যা আবেদনকারীকে লিখতেই হয়। সেখানে বিভিন্ন ধর্মের নামের সঙ্গে সঙ্গে ‘অন্যান্য’ বলেও লেখা থাকে। বেথুন কলেজের মতো এ বার সেই সব জায়গায় ধর্মের কলামে মানবতাকে রাখা যেতেই পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মনে করছেন, সব ধর্মেরই মূল কথা মানবতা। এখন ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে অনেক সময়ে বিভেদ সৃষ্টি হয়। আসলে ধর্মে ধর্মে কিন্তু কোনও বিভেদ নেই। শীর্ষেন্দুবাবুর কথায়, “আজকাল অনেকেই ধর্মীয় পরিচয় দিতে চান না বা দিতে লজ্জা পান। সে ক্ষেত্রে মানবতাকে বেছে নেওয়ার এই সুযোগ থাকাটা ভাল। তাতে আবেদনকারীকে একটা স্বাধীনতাও দেওয়া হল।” সমাজতত্ত্বের শিক্ষক অভিজিৎ মিত্র এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, “এই উদ্যোগ অনুসরণযোগ্য।”

খবরের লিংক –
https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/bethune-college-and-midnapore-college-included-humanities-in-their-religion-section-1.999637

3. India Supreme Court bans election appeals using religion or caste

The Indian Supreme Court has ruled that politicians cannot use religion or caste to seek votes.

"Religion has no role in electoral process, which is a secular activity," the judges said in their ruling. The court said using religion or caste to seek votes amounted to corrupt practices under electoral laws.

The landmark ruling comes just weeks ahead of the crucial election in Uttar Pradesh state where the two issues generally dominate polls.Monday's ruling said the relationship between man and God was an individual choice and the state was forbidden from interfering in such an activity.

The ruling was passed by a seven-judge bench headed by Chief Justice TS Thakur, although there was a difference of opinion among the judges - four supported the order while three differed with it.

The three dissenting judges said "discussion on caste, creed and religion is constitutionally protected within and outside elections and this cannot be restricted" and that the issue should be left to parliament to decide.

Caste and religion are often central to Indian elections - most parties select candidates based on their religion or caste and campaigning often involves appealing to voters on these issues.
The court was hearing a question first raised in 1990 in a court in the western state of Maharashtra, which asked whether this was legitimate in elections.

সূত্র-
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-38487409

৪। নির্বাচন ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়া, ধর্ম-বর্ণের নামে ভোট চাওয়া যাবে না : সুপ্রিম নির্দেশ

নির্ণয় ভট্টাচার্য্য: জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া..." কবি নজরুলের এই অমোঘ উচ্চারণই যেন আজ প্রতিধ্বনিত হল সুপ্রিমকোর্টের সাত সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে। আদালত আক্ষরিক অর্থে ঐতিহাসিক এক রায়ে আজ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, জাত-ধর্ম-বর্ণের আবেগকে 'কাজে লাগিয়ে' কোনও রাজনীতিক ভারতীয় ভূখণ্ডে ভোট ভিক্ষা করতে পারবেন না। আর কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যদি তা করে থাকেন, তাহলে সেই কাজকে নির্বাচনী আইনের আওতায় 'দুর্নীতি' হিসাবেই গণ্য করা হবে।

শীর্ষ আদালতের স্বচ্ছ উক্তি, ভোট বা নির্বাচন একটি আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়া, সেখানে ধর্মীয় (বর্ণ বা জাতি) আবেগের কোনও স্থান নেই। সুপ্রিমকোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ আরও বলেছে যে, মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে'র উপর প্রতিষ্ঠিত, রাষ্ট্র সেখানে কোনও ভাবেই নাক গলাতে পারে না।

প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শীর্ষ আদালতের আজকের এই রায়ে নড়ে চড়ে বসেছে তামাম রাজনীতিক মহল। কারণ, উত্তর প্রদেশের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং 'স্পর্শকাতর' রাজ্যের নির্বাচনে প্রয়শই জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণের জিগির তুলে ভোটে ফায়দা তোলার চেষ্টা নতুন নয়। ফলে আজকের সুপ্রিম নির্দেশের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের 'সংস্কৃতি'তে অভ্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলি বেশ কিছুটা বেকায়দায়। তবে, শুধু উত্তর প্রদেশই নয়, সারা ভারতেই বিভিন্ন এলাকায় ভোট টানতে 'ভাবাবেগ'-এ ভরসা রাখেন দলমত নির্বিশেষে অনেক 'ঘোষীত ধর্মনিরপেক্ষ' দলও। ধর্মীয় ভাবাবেগের ঘোলা জলে মাছ ধরতে 'পটু' এইসব মৎস্যজীবীদের কার্যত আজ হুঁশিয়ার করল দেশের শীর্ষ আদালত।

খবরটির লিংক-
https://zeenews.india.com/bengali/nation/supreme-courts-virdict-on-using-religious-sentiment-in-election_157274.html

৫। স্কুলে সরস্বতী পুজো সংবিধান বিরোধী, বন্ধ করার আর্জি স্কুল পরিদর্শকের কাছে

পুরুলিয়ায় স্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ রাখার দাবি। আর্জি জানানো হল বিজ্ঞান মঞ্চের তরফ, - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পুজো সংবিধান বিরোধী, দাবি জানানো হল সংগঠনের তরফে।

স্কুলে সরস্বতী পুজো করা সংবিধান বিরোধী। একই ভাবে স্কুলে নবি দিবসের উৎসব পালন করারও বিরোধিতা করল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। অবিলম্বে সমস্ত সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে সরস্বতী পুজো এবং নবি দিবস পালন বন্ধ করার জন্য জেলা স্কুল পরিদর্শককে চিঠি দেওয়া হল সংগঠনের পুরুলিয়া শাখার তরফে।

সংগঠনের তরফে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের দেওয়া চিঠিতে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির তরফে বলা হয়েছে, যেহেতু ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, তাই সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনও স্কুলেই সরস্বতী পুজো বা নবি দিবসের মতো কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা অসাংবিধানিক।

চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, স্কুলে ব্রাহ্মণ ডেকে এনে সরস্বতী পুজো করানো সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদের বিরোধী। কারণ এই প্রথা অন্য জাতিদের মনে অস্পৃশ্যতার ভাবনা সৃষ্টি করবে। শুধু তাই নয়, স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষাদানও সম্পূর্ণ বেআইনি বলে চিঠিতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রথায় অন্য জাতিকে ছোট করে দেখানো হয়। যা স্কুল পড়ুয়াদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

২০০১ সাল থেকেই স্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে আছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। এ বছরও সরস্বতী পুজোর আগে পুরনো দাবি নিয়ে ফের সক্রিয় তারা।

ছাত্রছাত্রীরা অবশ্য বিজ্ঞান মঞ্চের এই যুক্তি মানতে নারাজ। তারা সরস্বতী পুজোর জন্য সারা বছর অপেক্ষায় থাকে। তাই সংবিধানের যুক্তি দেখতে তারা নারাজ। পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও এমন দাবিতে অবাক।

যদিও এখনও এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি জেলা স্কুল পরিদর্শক। নতুন কোনও নির্দেশিকাও জারি করা হয়নি। বিভিন্ন সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকরাও জানাচ্ছেন, তাঁরা অন্যান্য বছরের মতোই সরস্বতী পুজোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

খবরটির লিংক-
https://bangla.asianetnews.com/west-bengal/science-forum-urges-to-stop-saraswati-puja-in-schools-in-purulia-q4cob4

৬। মদের নেশায় মানুষকে ছাগল ভেবে কোপ!

কথা ছিল সংক্রান্তির উৎসবে ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা হবে ছাগল। সেই অনুযায়ী, ছাগলকে ধরে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল হাড়িকাঠে। কিন্তু মদের নেশায় ছাগলকে কোপ না দিয়ে দিয়েছেন ছাগলটিকে ধরে রাখা এক ব্যক্তির ঘাড়ে। ছাগল বলির জায়গায় হলো নরবলি! খবর আনন্দবাজার পত্রিকায়।

এ কাণ্ডটি গত রোববার ভারতের হায়দরাবাদের চিত্তুর জেলায় ঘটেছে। নেশাগ্রস্ত ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পৌষ সংক্রান্তির দিন দেবতাকে ছাগল উৎসর্গ করা চিত্তুর জেলার ভালাসাপল্লির বহু দিনের রীতি। রোববার তেমনই পুজোপাঠ চলছিল। বলির জন্য উৎসর্গ করা ছাগলটিকে স্নান করিয়ে সিঁদুর মেখে হাড়িকাঠে এনে রেখেছিলেন সুরেশ।

আসন্ন মৃত্যু টের পেয়েছিল ছাগলটিও। তারস্বরে চিৎকার করছিল। বাজনা বাজছিল চারদিকে। এই অবস্থায় মদের ঘোর ভেঙে জেগে ওঠেন চালাপতি। হাতে বিশাল খাঁড়া নিয়ে উঠে দাঁড়ান। বাজনার জোর আরও বাড়ে, পাল্লা দিয়ে বাড়ে ছাগলের চিৎকার। ছাগলটি যেন হাড়িকাঠ থেকে বেরিয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করতে সুরেশ তার চার পা ভাল করে ধরে রেখেছিলেন।

বিশাল দা বিদ্যুৎগতিতে নেমে আসে সোজা সুরেশের গলায়। প্রাণ বাঁচানোর আর সময় পাননি সুরেশ। ভারী ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। আরও প্রবল হয় ছাগলের চিৎকার, কিন্তু এই দফায় বেঁচে যায় সেটি।

মুহূর্তে আশেপাশের সবাই বুঝতে পারেন, গন্ডগোল হয়েছে বিরাট। দ্রুত সুরেশকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। চালাপতিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

স্থানীয়দের দাবি, চালাপতি মদের নেশায় এতটাই আচ্ছন্ন ছিলেন যে ছাগল আর মানুষের তফাৎ করতে পারেননি। ছাগলের গলায় কোপ বসাতে গিয়ে তার দা নেমে আসে সুরেশের ঘাড়ে।

Drunk man slaughters human instead of goat during animal sacrifice in Andhra Pradesh

লিংক-

https://www.indiatoday.in/india/story/drunk-man-slaughters-human-instead-of-goat-during-animal-sacrifice-in-andhra-pradesh-1901263-2022-01-18

শিশুদের যৌনহেনস্তা রোধে যে আইন-

শিশুদের প্রতি যাতে কোনও ধরণের যৌন অপরাধ না হয়, তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে আইন, তাকেই ‘পকসো’ বলা হয়। পুরো নাম, “দ্য প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট ২০১২”। শুধু নিরাপত্তা দেওয়া নয়, কোনও শিশুর প্রতি কোনওপ্রকার যৌন অপরাধ ঘটলে কীভাবে বা কী পদ্ধতিতে তার বিচার হবে, কোন আদালতে তার বিচার হবে, কোন পদ্ধতিতে শিশুটির সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে, কোন পদ্ধতিতে তদন্ত হবে, শিশুটির চিকিৎসা কীভাবে হবে-ইত্যাদি বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে এই আইনে।

পকসো আইনে ১৮ বছরের নিচে বাচ্চাদেরই শুধু শিশু বলে গণ্য করা হবে। এখন দেখা যাক এই আইনে কী কী শাস্তির বিধান আছে।

- যৌন নির্যাতন বা ধর্ষণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৭ থেকে ১০ বছরের জেল ও জরিমানা। সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও জরিমানা।
- যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সাজা ৩ থেকে ৫ বছরের কারাবাস। সর্বোচ্চ সাজা ৫ থেকে ৭ বছরের কারাবাস ও জরিমানা।
- অশ্লীল কাজের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫ বছর জেল ও জরিমানা। সর্বোচ্চ ৭ বছর জেল ও জরিমানা। এছাড়াও আইনে বলা হয়েছে
- যৌন হয়রানির শিকার শিশুর জবানবন্দী নিতে হবে তার বাড়ি বা পছন্দ মত স্থানে। এই মামলায় প্রাধান্য দিতে হবে মহিলা পুলিশ আধিকারিককে।
- রাতে শিশুকে থানায় আনা যাবে না।
- জবানবন্দির সময় পুলিশ ইউনিফর্ম পরে থাকা চলবে না।
- শিশুর কথা শুনে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করতে হবে। শিশুর কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ নেওয়া যাবে না।
- প্রয়োজনে জবানবন্দির সময় শিশুটির জন্য দোভাষীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শারীরিকভাবে অক্ষম শিশুর জবানবন্দি নেওয়ার সময় পরিবারের লোকের সাহায্য নিতে হবে।
- মেডিক্যাল পরীক্ষার সময় শিশুর মা-বাবা কিংবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপস্থিতি দরকার।
- নির্যাতিতা মহিলা হলে, মেডিক্যাল পরীক্ষার সময় মহিলা চিকিৎসক থাকতে হবে।
- বিচার চলাকালীন শিশুর বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকবে হবে।
- কোনও উত্তেজনামূলক প্রশ্ন শিশুকে করা যাবে না।
- নির্যাতিতা শিশুর নাম বিচারের সময় গোপন রাখতে হবে।
- বিশেষ আদালতের নির্দেশ ছাড়া এই খবর প্রকাশ করা যাবে না।
- বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ দল ২৪ ঘণ্টার ভিতরে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে পুরো ঘটনা জানাতে হবে।
- শিশুটির গুরুতর আঘাত বা ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অপরাধের ৩০ দিনের মধ্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শিশুর কাছে যা প্রমাণ আছে, তা আদালতে নথিভুক্ত করতে হবে। সম্প্রতি এই আইনের বিশেষ সংশোধনী আনা হয়েছে। একটি সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পকসো আইনের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ধারা সংশোধন করা হচ্ছে। নৃশংসতায় দোষীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। পাশাপাশি, চাইল্ড পর্নোগ্রাফি রুখতেও পকসো আইনে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অজানা বিজ্ঞান

উপস্থাপনায়- দেবব্রত দাস

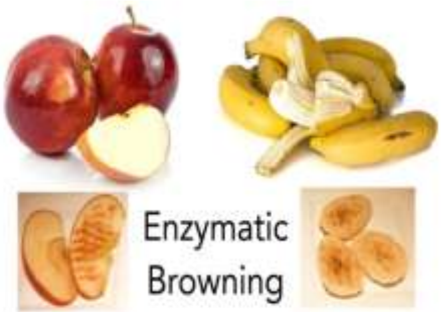
১। আপেল, পেয়ারা, কলা, নাসপাতি কেটে রাখলে বাদামি হয়ে যায় কেন?



ভাবছেন, আপেলের লোহা বা আয়রন বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে মরিচা পড়ার মতো বিক্রিয়ায় বাদামি হয়? ইন্টারনেটে এমন ব্যাখ্যাই বেশি চোখে পড়বে। কিন্তু সত্যিটা হল, আপেলের বাদামি হওয়ার জন্য লোহাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

আপেল ছাড়াও কলা, পেয়ারা, নাশপাতি, আলু ইত্যাদি কেটে রাখলে বাদামি হয়ে যায়। এসব ফল বা সবজিতে প্রতি ১০০ গ্রামে ০.৩-০.৮ মিলিগ্রাম পর্যন্ত লোহা থাকে। লোহার জারণ বা অক্সিডেশন যদি এই বাদামি রঙের কারণ না হয়, তাহলে ঘটনাটা কী?

আপেল কেটে রেখে দিলেই কিছুক্ষণ পর বাদামী বর্ণ ধারণ করে। আপেল কাটার সময় ফলের কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কোষ থেকে polyphenol oxidase এনজাইম বের হয়। এই এনজাইম আপেলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফেনল যৌগকে জারিত করে। বেশিরভাগ উদ্ভিদকোষে পলিফেনল অক্সিডেজ (প্রাণিকোষের বেলায় টাইরোসিনেজ) নামে এনজাইম থাকে। আর কোষের ভেতর থাকে ফেনল নামক এক জৈবযৌগের বিভিন্ন উপজাত। কিন্তু উদ্ভিদকোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বাতাসের সংস্পর্শে এলে পলিফেনল অক্সিডেজ এনজাইমের প্রভাবে কোষের ফেনলীয় যৌগগুলো অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে পাশাপাশি পরস্পর যুক্ত হয়ে পলিফেনল নামের পলিমার তৈরি করে। এ পলিমার থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়ার কিছু ধাপ পেরিয়ে তৈরি হয় মেলানিন। হ্যাঁ! ঠিকই পড়েছেন —মেলানিন। যে মেলানিন আমাদের ত্বকে পাওয়া যায়, সেই মেলানিন। কাটা আপেলের, পেয়ারা, নাসপাতি, কলার বাদামি রংটিও মেলানিনে তৈরি।



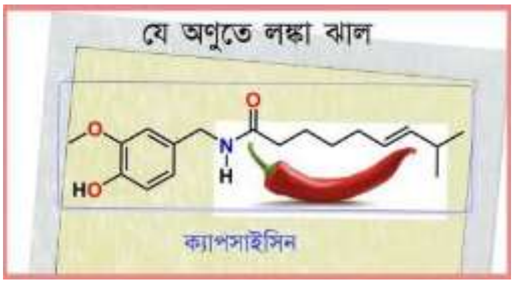
২। ওল ও কচু খেলে গলা ধরে বা চুলকায় কেন?

কচু Araceae গোত্রভুক্ত এক ধরনের কন্দজাতীয় উদ্ভিদ। কচু গাছের মূল, কান্ড, পাতাসহ বিভিন্ন অংশে ক্যালশিয়াম অক্সালেট এরকেলাস থাকে। এগুলি কচু গাছের দেহের রেচন পদার্থ। যাকে রাফাইড (raphides) বলা হয়। এই কেলাসগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্রায় সূচাকার হয়। ইকেলাসগুলি রান্না করার সময় সাধারণত অত্যাধিক তাপে গলে যায়। কিন্তু কখনো কখনো তা অক্ষত অবস্থায় থেকে যায়। খাবার সময় এগুলোই গলায় বিঁধে যায়। তখন গলা মুখ চুলকানো বা ফুলে যাওয়ার মত অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। ক্যালশিয়াম অক্সালেট ক্ষারীয় হওয়ায় এটি জৈব অম্লে দ্রবণীয়। লেবুতে জৈব সাইট্রিক অ্যাসিড এবং তেতুলে টারটারিক অ্যাসিড থাকে। তাই লেবু বা তেতুলের পানি খেলে গলার চুলকানি প্রশমিত হয়।

এই ক্যালসিয়াম অক্সালেট দীর্ঘদিন ধরে কিডনিতে জমতে থাকলে রেনালক্যালকুলি বা কিডনিতে পাথরের মত সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৩। ঝাল লাগে কেন?

জানো কি বেনিমাধব ঝাল কোনও স্বাদ নয়, এ এক বিশেষ ধরনের অনুভূতি, অবাক হচ্ছতো, আবার দেখবে ঝাল খাওয়ার পর জল খেলে আরও বেশি ঝাল লাগে, তাহলে বলি শোনো।



দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো গেলেও ঝালের স্বাদ মরিচ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে মেটানো দায়। পেটের ক্ষুধা মেটাতে ঝাল মরিচের প্রয়োজন না থাকলেও মনের ক্ষুধা মেটাতে ঝাল মরিচের ভূমিকা অপরিসীম। জাতিগতভাবে আমাদের ঝাল খাবার খুব পছন্দ। এই ভালোবাসা কখনো প্রকাশ পায় ভর্তার সঙ্গে, কখনো আবার পান্তা বা ঝালমুড়ির সঙ্গে। এই ঝাল আসলে কোনও স্বাদ নয়। ঝাল এক ধরনের অনুভূতি।

আমাদের জিভ যে পাঁচটি স্বাদ বুঝতে পারে, তার মধ্যে ঝাল নেই। আমাদের জিভে প্রায় ১০ হাজার স্বাদগ্রন্থি এবং ধারক কোষ থাকে, যা আমাদের পাঁচ ধরনের স্বাদ বুঝতে সাহায্য করে। জিভের ডগা বা অগ্রভাগে মিষ্টি এবং পশ্চাদ্‌ভাগে তিক্ত বা তেতো স্বাদগ্রাহক থাকে, অগ্রভাগের কিছু পরে এবং মাঝখানে লবণাক্ত বা নোনতা, দুই পাশে টক ও উমামি স্বাদ গ্রহণের জন্য একটি করে অংশ থাকে। উমামি হচ্ছে ক্ষুধাবর্ধক স্বাদ এবং একে সুগন্ধি বা মাংসের গন্ধযুক্ত স্বাদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই স্বাদ পনির ও সয়া সসে পাওয়া যায়। এবারে বুঝলে তো কষা মাংস রান্না করার সময় যে গন্ধ পাওয়া যায় তা হল উমামি।

ঝাল আসলে কোনও স্বাদ নয়। এটা একধরনের অনুভূতি। এই অনুভূতি তৈরি হয় একধরনের জ্বালাপোড়া ও উষ্ণতা থেকে। লঙ্কার ঝালের জন্য প্রধানত যে অণু দায়ী তার নাম ক্যাপসাইসিন (Capsaicin)। নামটা অত জটিল নয়। আমরা তো ক্যাপসিকাম নামক সবজির নাম শুনেছি। আবার ক্যাপসাইসিন অজৈব পদার্থ হওয়ায়, ঝাল খাওয়ার পরে জল খেলে ক্যাপসাইসিন অনু জলে দ্রবীভূত হয় না ফলে আরও বেশি ঝাল লাগে।



বিভিন্ন মরিচের মধ্যেও এই ক্যাপসাইসিন নামের রাসায়নিক উপাদান থাকে। ক্যাপসাইসিনসমৃদ্ধ রাসায়নিক উপাদানযুক্ত খাবার খাওয়ার পর তা জিবের স্বাদগ্রন্থিগুলোর সঙ্গে মিশে মুখের ভেতর একধরনের জ্বালাপোড়া ও উষ্ণতা তৈরি করে, যা আমাদের ঝালের অনুভূতি দেয়।

চেতনা পত্রিকার জন্য লেখা পাঠান yuktibadira@gmail.comএ। যুক্তির পথে আমরা। ধন্যবাদ।